KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : কবিতাভবন ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলি-২৯
Collection : KLMLGK	Publisher : বুদ্ধদেব বসু
Title : কবিতা (KAVITA)	Size : 5.5" x 8.5"
Vol. & Number : 23/3 24/1 24/2 (Special NO.) 24/2 (Special NO.) 24/4 25/3	Year of Publication : March 1959 Sep 1959 Jan 1960 (আষাঢ় ১৩৬৭) (চৈত্র ১৩৬৭)
	Condition : Brittle ✓ / Good ✓
Editor : বুদ্ধদেব বসু	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

কবিতা

আষাঢ় ১৩৬৭

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও গদ্যশিল্প
বুদ্ধদেব বসু

—

ভেরলেন ও ভালেরি অনুবাদ

—

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, গোপাল ভৌমিক,
বটকৃষ্ণ দাস, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

—

এক টাকা

[library stamp: ... লাইব্রেরি ... কলিকাতা-৭০০ ০০৯]

কবিতা

বর্ষ ২৪, সংখ্যা ৪, ক্রমিক সংখ্যা ১০২

আষাঢ় ১৩৬৭

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও গদ্যশিল্প
বুদ্ধদেব বসু

—

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, তারাপদ রায়, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত,
লোকনাথ ভট্টাচার্য, বটকৃষ্ণ দাস, অমর ষড়ঙ্গী,
অমিতাভ খাস্তগীর, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,
মণিভূষণ ভট্টাচার্য, আবুল কাশেম রহিমউদ্দীন,
গোপাল ভৌমিক, মোহিত চট্টোপাধ্যায়

—

পোল ভেরলেন-এর দুটি কবিতা
গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

—

ইন্দিরা দেবী স্মরণে
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

সমৃদ্ধ সংস্কৃতির বাহন

তাঁতীর মাকু আর টাকু বহু ইতিহাস পেরিয়ে আজও অম্লান। আজকের যন্ত্রশিল্প তার বয়ন সৌকর্যে নগর-জীবনকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে, তাঁতের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য তেমনই গৌরবান্বিত করেছে তাকে। প্রাচীন ও নবীনের টানাপোড়েনে সমৃদ্ধ বয়ন শিল্পের আভিজাত্যে এ দেশের মানুষকে সমৃদ্ধ ক'রে তোলার দায়িত্ব রেলপথই বহন করে চলেছে।

পূর্ব রেলওয়ে

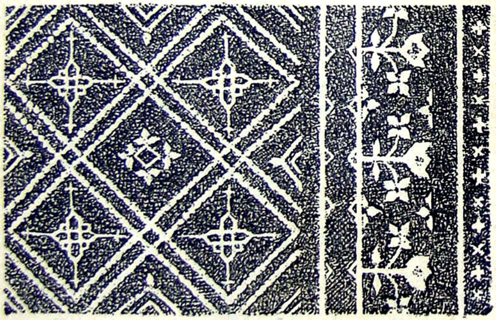

কবিতা আষাঢ় ১৩৬৭ বর্ষ ২৪ সংখ্যা ৪ ক্রমিক সংখ্যা ১০২

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও গদ্যশিল্প

বুদ্ধদেব বসু

রবীন্দ্রনাথ গদ্য লিখেছেন কবির মতো; তাঁর গদ্যের গুণ কবিতারই গুণ; যা কবিতা আমাদের দিতে পারে, তা-ই তাঁর গদ্যের উপঢৌকন। যদি কোনো খণ্ডপ্রলয়ে তাঁর সব কবিতার বই লুপ্ত হ'য়ে যায়, থাকে শুধু নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ, তাহ'লে সেই প্রবন্ধ নাটক উপন্যাস থেকেই ভাবীকালের পাঠক বুঝে নিতে পারবে যে রবীন্দ্রনাথ এক মহাকবির নাম।

হ্যাঁ, প্রবন্ধ থেকেও বুঝে নিতে পারবে। প্রবন্ধ: যাতে স্পষ্ট কোনো বিষয় চাই, বিশেষ কোনো পদ্ধতি চাই, যাতে যুক্তির সিঁড়ি ভেঙে-ভেঙে মীমাংসার দিকে পৌছতে হয়—অন্তত সেইরকমই ধারণা করি আমরা—তাতেও এই অবিশ্বাস্য কবি পরতে-পরতে প্রবিষ্ট হ'য়ে আছেন; যে-কোনো বিষয়ে যে-কোনো আলোচনায় বিষয়টাকে ছাপিয়ে ওঠে তাঁর স্বর, দ্যুতি, স্পন্দন, বেগ, তরঙ্গ—এক কথায়, তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ। অর্থাৎ, প্রবন্ধ যেমনটি হওয়া উচিত নয় ব'লে আমরা জানি—অন্তত পক্ষে পাঠশালায় যা শেখানো হ'য়ে থাকে—তাঁর প্রবন্ধ ঠিক তা-ই।

যাঁরা রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের পক্ষপাতী নন, বা যাঁরা মনে করেন আলোচনা-ধর্মী রচনায় কবিতার গুণ দোষ ব'লে গণ্য, অতএব বর্জনীয়, আমি তাঁদের কথা বেশ বুঝতে পারি। এমনকি তাঁদের কথায় সায় দিয়ে ফেলতেও লুব্ধ হয়েছি মাঝে-মাঝে। সত্যি তো—রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে কত পুনরুক্তি, কত অবান্তর অংশ, অনেক ব'লেও মীমাংসা যেন অস্পষ্ট থেকে যায়, গুরুমশাই-ধরনে 'বুঝিয়ে' যেন বলতে পারেন না। যুক্তির বদলে তিনি দেন উপমা, তথ্যের বদলে চিত্রকল্প; যেখানে পাঠককে স্বমতে টেনে আনা তাঁর প্রকাশ্য অভিপ্রায় সেখানে তিনি তীক্ষ্ণ ক'রে তোলেন তার ইন্দ্রিয়গুলিকে; যেখানে বুদ্ধির কাছে প্রমাণ দিতে হবে সেখানে তিনি বেআইনিভাবে আমাদের হৃদয়ের আর্দ্রতা সম্পাদন করেন। সমাজ, রাজনীতি, শিক্ষা, ইতিহাস—এই সব

বিষয়ে, পূর্বোক্ত দুর্বলতা সত্ত্বেও, শব্দালংকার থেকে বক্তব্যকে তবু আলাদা ক'রে নেয়া যায় ও চেনা যায়; কিন্তু—যা তাঁর প্রিয়তম ও অন্তরতম, সেই সাহিত্য বিষয়ে যখন আলোচনা করেন তখন কোনো বিশ্লেষযোগ্য 'সারাংশ' যেন দুর্লভ হ'য়ে ওঠে; তাতে থাকে না কোনো পরিচ্ছন্ন সংজ্ঞার্থ বা বিধান; কোনো সুস্পষ্ট সূত্র ঘোষণা করতে তাঁকে অক্ষম বা অনিচ্ছুক ব'লে মনে হয়, কিংবা কখনো তা ক'রে ফেললেও নিজেই সেটাকে খণ্ডন করেন—হয়তো বা পরমুহূর্তেই। মানতেই হবে, যে-অর্থে আরিস্টটল, আনন্দবর্ধন বা মল্লিনাথ সমালোচক, সে-অর্থে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের সমালোচক পর্যন্ত নন।

তা না-ই বা হলেন; ঐ পদবি তাঁর প্রাপ্য কিনা তা নিয়ে তর্ক করবো না আমরা। শুধু বলি: একাধারে সফোক্লেস ও আরিস্টটল কি হওয়া যায়, বা একাধারে কালিদাস ও মল্লিনাথ—সেটা কি স্বাভাবিক, না কাম্য, না সম্ভব, না কি মর্তলোকের পক্ষে সহনীয়? আর-এক কথা: হোমর ও সফোক্লেস যদি আগে জ'ন্মে না যেতেন, তাহ'লে কোথায় থাকতেন আরিস্টটল; বাল্মীকি কালিদাস প্রভৃতি কবিদের সামনে না-রেখে কোনো আনন্দবর্ধনকে কল্পনা করতে পারি কি? সাহিত্যব্যাপারে সৃষ্টিকর্মই প্রধান ও প্রাথমিক, সমালোচনা তার অনুগামী মাত্র; এবং কোনো উত্তম সৃষ্টিশীল প্রতিভা যখন সমালোচনায় হাত দেন তখন তাঁর পক্ষে যা সম্ভব হ'তে পারে তা 'সমালোচনাকেই সৃষ্টিকর্ম করে তোলা।' এই কথাটা রবীন্দ্রনাথই বলেছিলেন; তাঁর প্রবন্ধের আলোচনায় এটি মনে রাখতে হবে। মেনে নিতে হবে, পদ্য ও গদ্য রচনা মিলিয়ে তাঁর ব্যক্তিত্বের যে-অখণ্ডতা প্রকাশ পাচ্ছে সেইটেই তিনি; কোনো পাঠকগোষ্ঠীকে খুশি করার জন্য তা ছাড়া অন্য কিছু তিনি হ'তে পারেন না; আমরা গ্রহণ করি বা না করি তিনি অনবচ্ছিন্নভাবে তিনিই থেকে যাবেন। তাঁর গদ্য অতিভাষী? তাঁর কবিতাও তা-ই। অলংকারবহুল? অস্পষ্ট? উচ্ছ্বাসপ্রবণ? তাঁর কোনো-না-কোনো পর্যায়ের কবিতা বিষয়ে এর প্রত্যেকটি কথা সত্য। যেমন 'বসন্তযাপনে'র মতো গদ্যরচনায় তিনি প্রবন্ধের আকারে কবিতা লিখেছেন, তেমনি কবিতার আকারে প্রবন্ধ লিখেছেন 'এবারে ফিরাও

মোরে' বা 'বসুন্ধরা'য়। আমরা তাঁকে দোষ দিতে পারি সাহিত্যে বর্ণসংকরতা ঘটিয়েছেন ব'লে; গদ্যে কবিতার রীতি, ও কবিতায় গদ্য বিষয়ের সঞ্চার ক'রে তিনি উভয়েরই ক্ষতি করেছেন এমন কথাও স্বীকার্য হ'তে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে-প্রশ্নটি সবচেয়ে জরুরি হ'য়ে ওঠে তা এই: আমরা তাঁকে বর্জন করতে পারি কি? রবীন্দ্রনাথের দোষগুলি শিশুদের মতো সরল, কোনো ভান নেই তাদের, আত্মগোপনের কোনো চেষ্টাই নেই, নিজের বাড়ির আঙিনায় ব'সে অত্যন্ত সহজে তারা খেলা করে, দর্শকের হাতে ধরা প'ড়ে যেতে ভয় করে না, ধরা প'ড়ে গিয়েও মলিন হ'তে জানে না। এক বিরাট প্রতিভার আশ্রয়ে খেয়ে-প'রে বড়ো হচ্ছে তারা; যেমন তাদের হ্রাসপ্রাপ্তির লক্ষণ নেই, তেমনি তাদের উৎসস্থল সেই প্রতিভাও পরাক্রান্ত; প্রয়োজন হ'লে তা বজ্রপাতের মতো অবিশ্বাসীকে বিদীর্ণ করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ সেই লেখক, যাঁর দোষ আমরা যে-কেউ যে-কোনোদিন ধরতে পারি, আর যাঁকে না-হ'লে আমাদের কারোরই এক মুহূর্ত চলে না। আর এখানেই তাঁর চরম জয় যে তিনি অপরিহার্য: তাঁর দোষগুলিকে ছাড়াতে গেলে তাঁকেই ছেড়ে দিতে হয়, তাই সব দোষ নিয়েই—যখন মনে-মনে তাঁর 'বিরুদ্ধে' তর্ক করছি ঠিক তখনই সব দোষ নিয়েই তাঁকে বরণ ক'রে নিতে হবে; উৎকর্ষের অন্য বহু উদাহরণ তাঁকে ম্লান ক'রে দিতে পারে না, যেমন পারে না বহু তীর্থের স্মৃতি গৃহদেবতাকে অপসৃত করতে।

কিন্তু কোন অর্থে অপরিহার্য, কোন অর্থে গৃহদেবতা? তিনি 'কথা ও কাহিনী' না-লিখলে মধ্য বিদ্যালয়ে পড়াবার মতো ভালো বাংলা কবিতার বই পাওয়া যেতো না, সেইজন্য? 'জনগণমন' রচনা না-করলে সর্বভারতে সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য জাতীয় সংগীত দুষ্প্রাপ্য হ'তো, তাই? 'গীতবিতান' প্রণয়ন না-করলে উৎসবে, অন্নপ্রাশনে, শ্রাদ্ধবাসরে, ও চলচ্চিত্রে নায়িকা-কর্তৃক গীত হবার মতো সংগীতের অভাব ঘটতো ব'লে? না কি তাঁর প্রবন্ধের ভাণ্ডার থেকে বক্তৃতায় ও সাংবাদিক রচনায় উদ্ধৃতিযোগ্য বচন আমরা অনবরত পেয়ে যাচ্ছি, সেইজন্য? বাংলাদেশে ও সর্বভারতে তাঁর

যে-প্রাতিষ্ঠানিক মূর্তি স্থাপিত হয়েছে—যাকে বিগ্রহ বললে ভুল হয় না—তার উপর জোর দিতে চাচ্ছি না আমি; যেখানে আমরা উঠতে-বসতে তাঁর নাম করছি, প্রায় যে-কোনো অনুষ্ঠান আরম্ভ করছি তাঁকে স্মরণ ক'রে, প্রায় যে-কোনো মতবাদের সমর্থকরূপে দাঁড় করাচ্ছি তাঁকে, সেখানে তিনি সর্বজনের স্বতঃপ্রাপ্ত আশ্রয়, আমাদের আত্মসম্মানের পক্ষে প্রয়োজনীয়, মহিমার একটি প্রতীকরূপে সর্বভারতের পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু ও-রকম বিনাব্যয়ে কোনো পাঠক তাঁকে পেতেই পারেন না (কেননা পাঠক হ'তে হ'লে নিজের উপর দায়িত্ব নেবার শক্তি চাই); তাঁর রচনার মধ্যে প্রবেশ করতে হ'লে তাঁকে উপার্জন ক'রে নিতে হবে আমাদের; তিনি যে একজন বড়ো কবি বা ভালো কবি, এই মোটা কথাটাও আমাদের আবিষ্কারসাপেক্ষ। আর, একজন পাঠক হিশেবেই আমি বলতে চাই যে দোষ তাঁর যতই দেখতে পাওয়া যাক, তাঁকে না-হ'লে আমাদের এক দণ্ড চলবে না।

কিন্তু এক বাছাই-করা রবীন্দ্রনাথ কি সম্ভব হয় না? আমরা কি পেতে পারি না বাহুল্য বাদ দিয়ে তাঁর বাণী, উচ্ছ্বাস বর্জন ক'রে উপলব্ধি, কিংবা তাঁর 'শ্রেষ্ঠ' রচনার সমাহার? সেটা সম্ভব নয় বলতে পারি না, বরং আমরা মানতে বাধ্য যে তাঁর মতো অতিপ্রজ লেখকের পক্ষে সংকলন একটি উপকারী চিকিৎসা। সে-দিকে তাঁর নিজের ও অনুরাগী সম্পাদকদের প্রয়াস দেখা গেছে, সাহিত্য-আকাদেমির এই গ্রন্থেও* সে-চেষ্টা প্রতীয়মান। ভাবীকালেও, তাঁর রচনা থেকে চয়নের প্রয়োজন নিরন্তর অনুভূত হবে মনে হয়, কেননা তাঁকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখতে আমরা অভ্যস্ত হয়েছি; কোনো বিদেশী অথবা নতুন পাঠকের কাছে তাঁকে উপস্থিত করতে হ'লে প্রথমেই তাঁর বহুমুখিতা ও বৈচিত্র্যের পরিচয় দিতে চাই—'জানেন তো, তিনি সব রকম লেখা লিখেছেন, আর প্রায় এমন কোনো বিষয় নেই যা নিয়ে লেখেননি।' পাছে কেউ ভাবে যে তিনি শুধু কান্তকোমল পদাবলি লিখেছেন তাই আমরা

* সাহিত্য-আকাদেমি কর্তৃক প্রকাশিতব্য রবীন্দ্রনাথের 'নিবন্ধমালা' দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা।

চেষ্টা করি তাঁর সমাজবিষয়ক প্রবন্ধগুলিকে তুলে ধরতে; পাছে কারো ধারণা হয় যে ঈশ্বরকে ভালোবাসার ফলে জগৎটাকে তিনি দেখতে পাননি তাই আমরা 'গল্পগুচ্ছ' খুঁটে-খুঁটে তাঁর বাস্তববোধের উদাহরণ বের করি। এই সবই সৎকর্ম, তাঁর বিষয়ে আলোচনার পক্ষে প্রাসঙ্গিক, কিন্তু তাঁকে প্রদক্ষিণ করার পরে বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে সম্বন্ধস্থাপনে যখন উদ্যত হই তখনই ধরা পড়ে যে গভীরতম অর্থে তিনি কবি, কবি ছাড়া আর-কিছুই নন। এক উৎস থেকে, একই উৎসাহের প্রেরণায়, তাঁর বিখ্যাত ভিন্ন-ভিন্ন 'দিক'গুলি বিকীর্ণ—ঠিক যে-ভাবে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় বলা আছে—খোপে-খোপে ভাগ-করা মন নয় তাঁর, সাময়িকভাবে জুড়ে-দেয়া কিন্তু আসলে সম্পর্করহিত অনেকগুলো গাড়িকে এঞ্জিনের মতো টেনে নিয়ে যাচ্ছে না; তাঁর সব বৈচিত্র্য যেন প্রতিহত ও অপ্রতিরোধ্য জলস্রোতের গতিভঙ্গি। 'কবি রবীন্দ্রনাথ', 'ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ', 'প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ'—এই বিভাগগুলিকে তাই অস্বীকার না-ক'রেও শেষ পর্যন্ত স্বীকার করা যায় না; পরস্পরে প্রবিষ্ট তারা, পরস্পরের উদ্দীপক ও পরিপূরক, এবং এক অখণ্ড সত্তার প্রতিরূপ। যে-মৌলিক উপাদানে রবীন্দ্রনাথ গঠিত সেটা কবিত্বশক্তি, সেটাই তাঁর গদ্যরচনাকে সপ্রাণ ও সার্থক ক'রে তুলেছে; আগুন যেমন যে-কোনো ইন্ধনে ভাস্বর, তেমনি তাঁর কবিপ্রতিভাও যে-কোনো রূপকল্পে প্রদীপ্ত। দীপ্তির তারতম্য নিশ্চয়ই আছে; নিশ্চয়ই 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থে ও 'আত্মশক্তি' প্রবন্ধমালায় কবিত্বের একই প্রকার ঘনতা নেই; কিন্তু কবিতার দ্বারা স্পৃষ্ট ব'লেই তাঁর প্রায় যে-কোনো সন্দর্ভে কিছু-না-কিছু যৌবনশোণিমা লক্ষ করা যায়—হোক না তার প্রসঙ্গ পুরাতন বা বক্তব্য সুপরিচিত বা উপদেশ আজকের দিনে অবান্তর। হাড়ে-হাড়ে কবি নন এমন কেউ কি লিখতে পারতেন 'ছেলে-ভুলানো ছড়া'র মতো, সমালোচনা বা 'বাংলা ভাষাপরিচয়ে'র মুখবন্ধ, বা 'সহজ পাঠে'র মতো বর্ণপরিচয়পুস্তক? 'কবিতা আছে ভাষার সর্বত্র—ছন্দ থাকলেই কবিতা থাকবে—সর্বত্র আছে, নেই শুধু বিজ্ঞাপনে ও সংবাদপত্রে। সাহিত্যের যে-বিভাগটিকে আমরা "গদ্য" নাম

দিয়েছি তাতেও কবিতা আছে—মাঝে-মাঝে খুব ভালো কবিতা—নানা রকম ছন্দে তারা রচিত। আসলে গদ্য ব'লে কিছু নেই : আছে বর্ণমালা, আর নানা ধরনের কবিতা, কোনোটি শিথিল, কোনোটি সংহত, কোনোটি বা একটু বেশি ছড়িয়ে-যাওয়া। যেখানে স্টাইলের দিকে প্রযত্ন, সেখানেই পদবিন্যাস।' স্তেফান মালার্মের এই উক্তির প্রমাণস্বরূপ কোনো-একজন—সারা জগতের মধ্যে কোনো-এ ক জ ন কবিকে যদি দাঁড় করাতে হয়, তাহ'লে সেই কবি—মালার্মে নন, তাঁর শিষ্য পোল ভালেরিও নন—তর্কাতীতরূপে তিনি রবীন্দ্রনাথ। কেননা মালার্মে ও ভালেরির গদ্য তাঁদের কবিতার মতোই সাংকেতিক, গদ্যরচনার বিষয়গুলিও 'বিশুদ্ধ' ও নির্ভার—বলতে গেলে তাঁদের কবিতা ছাড়া বিষয় নেই, আর কবিতার বিষয়ে কবির মতো লিখতে গেলে অন্ততপক্ষে ব্যবহারিক প্রতিবন্ধক অল্পই থাকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গদ্য লিখেছেন সাধারণ ভাষায়, অনেক সময় নিরুৎসাহজনক সাংসারিক বিষয় নিয়ে (সমবায়নীতি বিষয়েও তাঁর প্রবন্ধ আছে), গদ্যকে কবিতার স্তরে উন্নীত করার সচেতন চেষ্টা বার্ধক্যের আগে তাঁকে করতে দেখি না। অথচ, যেহেতু স্টাইল তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক, ছন্দ তাঁর মজ্জাগত, তাই তাঁর সমগ্র গদ্যের মধ্যে এমন লেখা আপেক্ষিক অর্থে অল্পই (কিছু নেই তা নয়), যা প্রতিধ্বনি তোলে না, রেশ রেখে যায় না, স্পন্দিত হয় না স্মরণে, দেয় না সেই অপার্থিব অনুভূতি আমরা যার নাম দিয়েছি আনন্দ। এমনি ক'রে তাঁর গদ্যের ভিতরে কবিতাকে পাচ্ছি—'মাঝে-মাঝে খুব ভালো কবিতা, কোনোটি শিথিল, কোনোটি সংহত, কোনোটি বা একটু বেশি ছড়িয়ে-যাওয়া।'

২

'নিবন্ধমালা'র এই খণ্ডের প্রবন্ধগুলিকে পাঁচ অংশে ভাগ করা হয়েছে : 'আত্মপরিচয়,' 'পত্রধারা', 'ভ্রমণ', 'ভাষা ও সাহিত্য' ও 'বিচিত্র'। অংশের শিরোনামা থেকেই তার অন্তর্ভূত রচনাগুলির প্রকৃতি অনুমান ক'রে নেয়া

যাবে; শুধু 'বিচিত্র' অংশ বিষয়ে একটু বলা দরকার। এই বিশেষণটি রবীন্দ্রনাথ নিজেই ব্যবহার করেছিলেন—তাঁর 'বিচিত্র প্রবন্ধ' ১৩১৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়; তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসারে আমরা সেই সব রচনাকে 'বিচিত্র' ব'লে অভিহিত করছি, যেগুলোকে অন্য কোনো বিভাগের মধ্যে সঠিকভাবে ফেলা যায় না। আমরা বলতে চাচ্ছি, এই অংশের রচনাগুলিতে রচনাটাই প্রধান, বিষয়টা উপলক্ষ মাত্র; যে-কোনো একটি প্রসঙ্গ অবলম্বন ক'রে লেখক বিস্তার ক'রে দিলেন তাঁর ভাবনা ও কল্পনা, তাঁর মূল্যবোধ ও পক্ষপাত। এই ধরনের রচনার জন্য আধুনিক বাংলা ভাষায় একটি নতুন নাম উদ্ভাবিত হয়েছে—'রম্যরচনা' : ফরাশি বেল্‌-লেৎ-এর অনুকরণ এটি; কেউ-কেউ ব'লে থাকেন—বা আগে বলতেন—'ব্যক্তিগত প্রবন্ধ'। নতুন নামকরণের বিপদ এই যে তা অযোগ্যকে আকর্ষণ করে, 'রম্যরচনা'কেও—বাংলা ভাষায় তার সাম্প্রতিক প্রাদুর্ভাব দিয়ে বিচার করলে—অক্ষমের আশ্রয়স্থল বলার ইচ্ছে হ'লে অন্যায় হয় না। যাঁরা কবিতা প্রবন্ধ উপন্যাস কিছুই লিখতে পারেন না, এবং সত্যিকার সাংবাদিক পর্যন্ত নন, যাঁদের না আছে তথ্য বা জ্ঞান, না উদ্ভাবনশক্তি বা কলানৈপুণ্য, সংগতিরক্ষা ক'রে কোনো বিষয়ে এক দণ্ড চিন্তা করতে, বা পরস্পর দুটো বাক্য রচনা করতে যাঁরা স্বভাবগুণে অক্ষম, তাঁদের বিশৃঙ্খল প্রগল্‌ভতা ছাপার অক্ষরে উদ্ধত হ'য়ে উঠতে পারতো না, যদি না 'রম্যরচনা' শব্দটির সৃষ্টি হ'তো। কিন্তু যেহেতু বহু নিকৃষ্ট রচনা প্রশ্রয় পাচ্ছে সেহেতু আমরা বলতে পারি না যে ঐ শব্দই পরিত্যাজ্য, বা গদ্যরচনার ঐ বিশেষ রূপের অস্তিত্ব নেই। 'কবিতা' নামে প্রকাশিত অধিকাংশ রচনাই কবিতা নয় এটা যদি মেনে নিতে পারি, তাহ'লে অধিকাংশ 'রম্যরচনা' যদি রম্য না হয়, বা রচনাও না হয়, তাহ'লে অত্যন্ত বেশি বিচলিত হ'লে চলবে কেন? নতুন নামকরণের পারিভাষিক ঔচিত্য নিয়ে তর্ক উঠতে পারে, কিন্তু নতুন নামকরণের প্রয়োজন নেই বললে ভুল করা হয়। য়োরোপীয় ভাষায় 'essay' বলতে বিশেষ এক প্রকার সাহিত্যগুণসম্পন্ন রচনাকেই বোঝায়, কিন্তু আমাদের 'প্রবন্ধ' (সংস্কৃতে যার অর্থ ছিলো পদ্যে বা গদ্যে

যে-কোনো রচনা) শব্দের অর্থ এত বেশি ব্যাপক যে এক-এক সময় তাকে সীমিত ক'রে না-নিলে ঠিক কাজ চলে না। 'নাতিদীর্ঘ সাহিত্যগুণসম্পন্ন গদ্য রচনা' অর্থে 'essay' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন মিশেল মঁতেন—সাহিত্যের এই রূপটিও তাঁরই আবিষ্কার; পরবর্তী চারশো বছরে উদ্ভূত অন্য বহু উদাহরণের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে আজকের দিনের পশ্চিমী পাঠকরা 'essay' শব্দটি দেখলেই বুঝতে পারেন কী-ধরনের রচনা পরিবেশিত হচ্ছে। যদি কোনো জীববিজ্ঞানী সর্বাশী প্রাণীদের পাকস্থলী বিষয়ে কোনো গবেষণা প্রকাশ করেন, বা কোনো ধর্মবিদ প্রণয়ন করেন খৃষ্টীয় তত্ত্বের এক নতুন ব্যাখ্যা, বা কোনো ইতিহাসের অধ্যাপক রুশ বিপ্লবে লেনিন ও ট্রটস্কির ভূমিকার তুলনামূলক আলোচনা করেন—এর কোনোটিকেই কোনো পশ্চিমী পাঠক 'essay' বলবেন না; ও-সব জ্ঞানগর্ভ, বিধিবদ্ধ ও উদ্দেশ্যনির্ভর রচনার জন্য 'monograph', 'dissertation', 'tract', 'treatise' প্রভৃতি অন্য বহু শব্দের প্রচলন আছে। কিন্তু আমাদের ভাষায় রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত'ও প্রবন্ধের বই, স্বামী বিবেকানন্দের 'ভক্তিযোগ'ও তা-ই, আর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বিধবাবিবাহবিষয়ক প্রস্তাব'কেও, অন্য কোনো নামের অভাবে, 'প্রবন্ধ' না-ব'লে উপায় নেই। অস্বীকার করা যায় না, আরো দু-একটা ব্যবহারযোগ্য শব্দ হ'লে ভালো হয়।

যা দেখতে-শুনতে প্রবন্ধের মতো, এ-রকম গদ্যরচনার মধ্যে দুটো স্পষ্ট ভাগ দেখা যাচ্ছে : তার একটাতে বিষয় হ'লো সর্বস্ব বা মুখ্য, লেখক সেখানে নতুন জ্ঞান দিতে চাচ্ছেন, বা নতুন মত প্রচার করা তাঁর অভিপ্রায়। এ-সব রচনার সূচনা, মধ্যভাগ ও সমাপ্তির একান্ত নির্দেশক হ'লো বক্তব্য; প্রতিপাদ্য প্রমাণ করার জন্য যে-ক'টি যুক্তি ও উদাহরণের প্রয়োজন, লেখক তা পূর্বেই সংগ্রহ ক'রে নিয়েছেন—'লেখক' হিশেবে তাঁর সমস্যা শুধু সেই উপাদানগুলিকে ভাষার মধ্যে সংবদ্ধ করা;—ভাষা তাঁর কাছে বাহনমাত্র, অপরিহার্য যন্ত্র একটি—বলতে গেলে তাঁর উপাদানসমূহের শৃঙ্খলাসাধনই তাঁর রচনা। আর অন্যটিতে বিষয়টা গৌণ; লেখক রচনাকর্ম শুরু করার আগে—তাঁর বাঁচা,

মেলামেশা ও সাধারণ পড়াশুনোর বাইরে—কোনো 'গবেষণা' করেননি; কোনো পূর্বনির্দিষ্ট ধারণা বা সমাজের পক্ষে হিতকারী কোনো উদ্দেশ্য নিয়েও লিখতে বসেননি তিনি; লিখতে-লিখতে ভাবনা আসে তাঁর, নিজেকে অনুসরণ ক'রে প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে চ'লে যান; তাঁর সূচনা, মধ্যভাগ ও সমাপ্তির পিছনে থাকে—'বক্তব্য'কে উপস্থিত করার গরজ নয়, সেই সব অমোঘ ও অলক্ষ্য বিধান, যা কোনো কবিতা, নাটক বা উপন্যাসকে নিয়ন্ত্রিত করে। তাঁর ভাষায় থাকে রূপ, ছন্দ ও স্বাদুতা, পাঠকের সঙ্গে তাঁর ব্যবহারে থাকে সৌজন্য, আসক্তি, হাস্যরসবোধ, জগতের সঙ্গে তাঁর ব্যবহারে থাকে সংরাগ ও দূরকল্পনা। শিরোনামায় যে-'বিষয়ে'র উল্লেখ থাকে তা নিয়ে যতটা বলেন, হয়তো ততটাই থাকে তাঁর নিজের কথা; আমরা জানতে পারি কী-ভাবে এই জগৎ তাঁর চেতনার মধ্যে প্রবেশ করছে, কোথায় তাঁর প্রেম, কোন সংশয়ে তিনি দংশিত, কোন গোপন বেদনাকে রচনার মধ্য দিয়ে পরিপাক ক'রে নিচ্ছেন। অর্থাৎ, বিষয় যা-ই হোক না, তিনি ব্যক্ত করছেন নিজেকে (এই সূত্রটিও মঁতেনের), আর এই অর্থে তাঁর রচনা ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিনির্ভর, বলা যেতে পারে তাঁর ব্যক্তিতারই দর্পণ। মঁতেন নিঃকুণ্ঠভাবে 'আমি' শব্দ ব্যবহার করেছেন, রবীন্দ্রনাথের 'আমরা'টিও 'আমি'র একটি বিনয়ী ও চতুর প্রকরণ; এবং এই 'আমি'—গীতিকাব্যের বক্তার মতোই—দেশ-কালের বিশেষ লক্ষণদ্বারা চিহ্নিত হ'য়েও বিশ্বমানবের প্রতিভূ। জীববিজ্ঞানী যখন সর্বাশী প্রাণীর পাকস্থলী বিষয়ে 'প্রবন্ধ' লেখেন তখন তাঁর ব্যক্তিত্বের একটিমাত্র অংশকে উদ্যোগী হ'তে হয়, কিন্তু অন্য যে-ধরনের প্রবন্ধের আমরা বর্ণনা করছি, তা লেখকের সমগ্র সত্তা থেকে নিঃসৃত; শুধু বুদ্ধির বা চিত্তের নয়, সেটা প্রাণের ও অন্তঃকরণেরও কাজ; যে-মানুষ তার শিশুকন্যার বিনোদের জন্য মেঝেতে হামাগুড়ি দেয়, সর্দির ভয়ে সারা শীত স্নান করে না, অবসর পেলেই মহাভারত পড়ে, আলকাৎরার গন্ধ ভালোবাসে—সেই ইন্দ্রিয়বদ্ধ অসংগতিময় মানুষটিও তাতে সঞ্চারিত ও প্রতিফলিত হচ্ছে। যাকে বলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি তা এই বিরাট জগতের একটি বিচ্ছিন্ন কণিকার উপর সংহত হ'য়ে থাকে,

অন্ত সব-কিছুর অস্তিত্ব সেখানে লুপ্ত ; নিরঞ্জন জ্ঞান সেই দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। আমরা যাঁকে প্রবন্ধকার বলছি, তিনি এই বিচ্ছেদপ্রবণ ঐকান্তিক দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত। জগৎটা তার বিচিত্র উপাদান নিয়ে তাঁর চৈতন্যের উপর অনবরত আঘাত করছে ; সুখেদুঃখে আকাঙ্ক্ষায় স্পন্দমান রক্তমাংসের মানুষকে তিনি কখনো ভোলেন না ;—আর তাই তাঁর রচনা হ'য়ে ওঠে—সত্য নয়, জীবন্ত, শিক্ষণীয় নয়, নন্দনজনক ; তাতে থাকে না কোনো অমোঘ যুক্তি, কোনো ধ্রুব মীমাংসা, নিশ্চিতভাবে কিছুই বলেন না তিনি ; কিন্তু এমন কতগুলো ইঙ্গিত বিকীর্ণ ক'রে দেন যা সহৃদয় পাঠকের মনে বীজের মতো উড়ে এসে পড়ে—হয়তো ছড়িয়ে দেয় শিকড়, হয়তো কোনোদিন সেখানেও এক নতুন ভাবনাকে ফলিয়ে তোলে। বিজ্ঞানীর মতো কোনো প্রস্তুত সত্য তিনি আস্ত তুলে দেন না আমাদের হাতে—দিতে পারেন না ; তিনি পাঠককে তাঁর সহকারী ক'রে নেন ; যা তিনি আভাসে বলেন, উপমায় বলেন, বলেন গুঞ্জরণে ও বর্ণহিল্লোলে, তার 'অর্থ' পূর্ণতা পায় পাঠকের মনে—যদি পাঠক অযোগ্য না হন।

অতিরঞ্জন হচ্ছে কি ? বড্ড বেশি দাবি করা হচ্ছে ? কিন্তু আমি তো কোনো আদর্শ স্থাপন করছি না, রবীন্দ্রনাথেরই বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা করছি। এই প্রবন্ধ—বা প্রবন্ধের এই বিশেষ ধরন—য়োরোপে মঁতেন যার স্রষ্টা—আমাদের সাহিত্যে তার মহাশিল্পী হলেন রবীন্দ্রনাথ। এতে সিদ্ধিলাভের পক্ষে যে-সব গুণ প্রয়োজনীয় বা কাঙ্ক্ষণীয় মনে হ'তে পারে, তাঁর প্রতিভায় সেগুলোর সন্নিপাত ঘটেছিলো। শুধু 'বিচিত্র' নামধারী অংশ নয়, এই গ্রন্থের সব রচনাই পূর্বোক্ত গুণসম্পন্ন ; সবই সৃষ্টিশীল সাহিত্য ; তাদের মূল্য রচনার মধ্যেই, আধেয়বস্তুতে নয় ;—এমনকি তাঁর সামাজিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক প্রবন্ধের মধ্যে যেগুলি কালপ্রভাবে মলিন হ'য়ে যায়নি, সেগুলোতেও এই একই লক্ষণ বিদ্যমান। কেননা রবীন্দ্রনাথ সেই লেখক, যাঁর পক্ষে যে-কোনো সময়ে শিল্পী না-হওয়া দুঃসাধ্য ছিলো, যাঁর কোনো-কোনো প্রবন্ধগ্রন্থে (যেমন 'ছন্দ', 'বাংলা ভাষাপরিচয়') আমরা পাই গবেষণা ও নন্দনধর্মিতার সমন্বয়,

বিশ্লেষণদক্ষতার সঙ্গেই কবিতার উদ্বোধনীশক্তি। সাহিত্যের নিয়ম ও সংজ্ঞার্থগুলিকে তিনি সাবলীলভাবে অতিক্রম ক'রে যান : তাঁর আত্মজীবনী, ভ্রমণপঞ্জি ও চিঠিপত্রে আশানুরূপ তথ্য পাই না আমরা ; পাই না সমালোচনায় যথাযোগ্য তত্ত্বকথা। পক্ষান্তরে, সমালোচনার মধ্যে আত্মজীবনীর অবতারণা করতে বাধে না তাঁর, ভ্রমণপঞ্জিতে ভ্রমণ ভুলে গিয়ে জীবন, মৃত্যু ও শিল্পকলা বিষয়ে দূরকল্পনাকে প্রশ্রয় দেন। কোনো পাঠক ভুলেও যেন না ভাবেন যে তাঁর 'সমালোচনা'-চিহ্নিত বইগুলিতেই সাহিত্যবিষয়ে তাঁর সব বক্তব্য বিধৃত হ'য়ে আছে, বা তাঁর 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা'র বাইরে আর কোথাও আত্মজীবনী নেই। সাহিত্য বিষয়ে তিনি কী ভেবেছেন তা সম্পূর্ণভাবে জানতে হ'লে তাঁর চিঠিপত্র, আত্মজীবনী ও ভ্রমণপঞ্জিও পড়তে হবে, আর তাঁর জীবন বিষয়েও যথেষ্ট আমরা জানতে পাবো না যদি-না তাঁর সমালোচনার প্রতি মনোযোগী হই। এই গ্রন্থের বিভাগগুলি করা হয়েছে সুবিধের জন্য বা নিয়মরক্ষার খাতিরে ; আসলে এই সব প্রবন্ধই পরস্পর-সম্পৃক্ত।

৩

এবং তাঁর কবিতার সঙ্গেও এদের সম্বন্ধ নিবিড়। কবিদের বিষয়ে সাধারণভাবেই সত্য এই কথা, কিন্তু সব কবির কবিতা ও গদ্যরচনা একই ভাবে অন্বিত হয় না। যেমন রিলকের বিষয়ে, তেমনি রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে আমরা বলতে পারি না যে তাঁর কবিতা হৃদয়ঙ্গম করতে হ'লে তাঁর পত্রাবলির সঙ্গে পরিচয় অত্যাবশ্যক। মালার্মে বা ভালেরির মতো নন তিনি : ঘুরিয়ে, ফিরিয়ে, বেঁকিয়ে, পেঁচিয়ে, লুকিয়ে, ভুলিয়ে, ছলে, কৌশলে, সংকেতে, ফাঁদ পেতে—শিল্পকলার এমন একটি ভাবমূর্তি গড়ে তোলেন না, যা তাঁর স্বীয় কবিতার সঙ্গে অবিকল মিলে যায়। ইয়েটসের মতো আমাদের নিয়ে যান না তাঁর কবিতার অন্তঃপুরে ; কবিজীবনের বিবৃতিরূপে 'জীবনস্মৃতি' নিঃসন্দেহে নৈরাশ্যজনক। রবীন্দ্রনাথ যা করেছিলেন তা পুনরুক্তি ; একই কথা পদ্যে ও গদ্যে বলেছিলেন ; পরস্পরের পরিপূরক শুধু নয়, তাঁর কবিতা ও গদ্য এক-এক

সময় প্রায় বিনিময়ধর্মী। পাছে, যাঁরা আধুনিক কবিতায় দীক্ষিত, এ-কথা শুনে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা ক'মে যায়, তাই এখানে উল্লেখ করি যে শার্ল বোদলেয়ার—আধুনিক কবিতার আদি উৎস যিনি—তাঁর গদ্যেও তাঁর কবিতার প্রতিধ্বনি বিরল নয়; প্রবন্ধের মধ্যে কবিতার স্তবক স্থদ্ধ রচনা ক'রে দেন তিনি, ছিটিয়ে দেন কবিতার ভাণ্ডার থেকে আহৃত চিত্রকল্প, শব্দবন্ধ ও অলংকার, কখনো-কখনো একই উপাদান থেকে রচনা করেন তাঁর কবিতা ও সমালোচনা। দুই কবিতে প্রভেদ এইখানে—আর এই প্রভেদ তাৎপর্যময়—যে একই কথা রবীন্দ্রনাথ গদ্যে বলেছেন কম কথায় আর কবিতায় কলোচ্ছ্বাসে, আর বোদলেয়ার গদ্য লেখেন সবিস্তারে, কিন্তু কবিতায় তিনি কঠিনরূপে সংহত। 'জীবনস্মৃতি'র 'মৃত্যুশোক' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ দুটিমাত্র অনুচ্ছেদে যা বলেছিলেন, 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের শ্রেষ্ঠ অংশ তারই ব্যাখ্যা ও সম্প্রসারণ; কিন্তু বোদলেয়ারের শিল্পবিষয়ক প্রচুর সমালোচনার নির্যাস তাঁর 'আলোকস্তম্ভ' ('Les Phares') কবিতার এগারোটি চতুষ্পদীতে বিধৃত আছে। বোদলেয়ারের গদ্য যেন তাঁর ছুটির ঘণ্টা—এই রকম মনে হয় আমাদের: ছন্দ, মিল ও স্তবকবিন্যাসের ক্ষমাহীন শর্তপূরণের পরে, চতুর্দশপদীর ব্যূহের মধ্যে আদর্শকে সংবদ্ধ করার অক্লান্ত প্রয়াসের পরে, গদ্যে যেন নিজেকে নিষ্কৃতি দেন তিনি; সেটা তাঁর বিনোদ ও বিচরণের ক্ষেত্র, কৌতুকের মণ্ডপ এবং বিচারবুদ্ধির মৃগয়াভূমি; অর্থাৎ, তাঁর ব্যক্তিত্বের যে-অংশ সামাজিক, রসিক ও তত্ত্বদর্শী, যা তাঁর কবিতায় প্রচ্ছন্ন থেকে কবিতাকে মেঘচ্ছুরিত রৌদ্রের মতো রঞ্জিত ক'রে তুলেছে, তার স্বাধীন ক্রীড়া গদ্যপ্রবন্ধে তাঁর অনুমত ছিলো। বোদলেয়ারের গদ্য যত ভালোই হোক, তাঁর কবিতার বিকল্প বা সমকক্ষ হবার দাবি তা করে না; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতাকে সংবৃত করার চেষ্টা করেননি ব'লে, কখনো-কখনো তাঁর কবিতা ও গদ্যের পার্থক্য চিহ্নিত হয়েছে শুধুমাত্র পদ্যছন্দের ব্যবহার অথবা পংক্তিবিন্যাসের অসমমাত্রিক পদ্ধতির দ্বারা। 'পূরবী' থেকে 'জন্মদিনে', এই পর্যায়ের মধ্যে বহু কবিতা আমরা খুঁজে পাই, যা গদ্যে একই প্রকার বা অধিকতর মনোরম ক'রে রবীন্দ্রনাথ

লিখতে পারতেন বা লিখেই গিয়েছেন; 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি'র অনেক অংশকে প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ছন্দে-মিলে রূপায়িত করেছেন তিনি, 'শেষের কবিতা'র গদ্যশিল্প অনেক স্থলে কবিতাকে ম্লান ক'রে দিচ্ছে; গদ্যকবিতা 'বাসা' একখানা পত্রের সংস্কারসাধন; এবং পরবর্তী পত্রাবলিতে এমন কোনো-কোনো চমকপ্রদ বাক্য আমরা পাই, বা পলাতক ক্ষণকালীন ভাবচ্ছায়া, যাকে কাব্যরূপ দিতে গিয়ে তাঁকে কষ্টকল্পনার আশ্রয় নিতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কবিতা ও সমুদয় গদ্য পাশাপাশি রেখে চিন্তা করলে আমরা দেখতে পাই যে তাঁর কবিতা ও গদ্যের বিবর্তন সমান্তর নয়; তাঁর হাতে গদ্য যে-ভাবে বারে-বারে পরিবর্তিত হয়েছে, কবিতা সে-রকম হয়নি; কবিতায় তিনি যেন প্রকৃতির হাতে অভিষিক্ত এক সম্রাট, পদ্যাকারে যা-কিছু লিখবেন তা-ই কবিতা হবে, বা তা না-হ'লেও অন্ততপক্ষে উপাদেয় হবে, এই রকম একটা বিধান তিনি নিজেও প্রায় মেনে নিয়েছিলেন; কিন্তু গদ্যে তিনি অনেক বেশি সচেতন শিল্পী, নিজেকে নিজে লঙ্ঘন করতে অনবরত সচেষ্ট।

এমনি ক'রেই বাংলা সাহিত্যে এই অঘটন ঘটলো যে আমাদের ভাষার যিনি কবিগুরু, এবং যাঁর সমকক্ষ কবি আবহমান ভারতে আর নেই, তিনিই আমাদের গদ্যরীতির স্রষ্টা। 'স্রষ্টা' কথাটিতে ঐতিহাসিক দিক থেকে আপত্তি হ'তে পারে; বলা বাহুল্য, বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রকে আমি ভুলে যাচ্ছি না; আমি বলতে চাচ্ছি যে বঙ্কিম থেকে আজকের দিন পর্যন্ত বাংলা গদ্য যে-ভাবে বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়েছে, এবং আজকের দিনে আধুনিক বাংলা ভাষা বলতে যা বোঝায়, তার সাক্ষ্য, প্রমাণ ও উদাহরণের প্রধান ভাণ্ডার রবীন্দ্রনাথ। 'বৌঠাকুরানীর হাট' থেকে 'শেষের কবিতা', বা 'বিচিত্র প্রবন্ধ' থেকে 'ছেলেবেলা': এই গ্রন্থপর্যায় বাংলা গদ্যের ইতিহাসকে ধারণ ক'রে আছে; বঙ্কিমী ও বীরবলী গদ্য, 'সাধু' ও 'চলিত' ভাষা, ঘরোয়া, বৈঠকি ও দরবারি রীতি, প্রাচীন, আধুনিক ও আধুনিকতর শৈলী: এই তাঁর পঞ্চাশ বছরের কৃতিকে বাংলা গদ্যের অণুবিশ্ব বলতে পারি আমরা, হয়তো মহাবিশ্ব বললেও ভুল হবে না। এর মধ্যে সবই আছে: ভারি, হালকা, গম্ভীর, চপল,

সংস্কৃত ও দেশজ, সমতল ও বন্ধুর ; অত্যুক্তি, বক্রোক্তি ও স্বভাবোক্তি ; আছে বহু মিশ্র রাগিণী ; সাত্ত্বিক মিতাচারের পাশে বিলাসীর উচ্ছ্বাস, সামাজিক সৌজন্যের পাশে ঐশ্বর্যের আত্মবিকিরণ। 'জীবনস্মৃতি'র পরিমিত, যথোচিত, প্রাঞ্জল ও প্রসন্ন গদ্য যাঁর রচনা, তাঁকে আমরা আঠারো-শতকী ইংরেজি অর্থে 'ভদ্রলোক' বলতে পারি ; কিন্তু তার পরে হঠাৎ 'ঘরে বাইরে' খুললে অলংকরণের আতিশয্যে আমাদের প্রায় দম আটকে আসে ; মনে হয়, কালিদাসের ভাষা যদি বাংলা গদ্য হ'তো তাহ'লে তিনি যে-কাব্য লিখতেন, এ যেন তা-ই। আবার 'লিপিকা'য় আমরা জাদুকরের এক উল্টো খেলা দেখতে পাচ্ছি ; 'ঘরে বাইরে'র প্রায় সমকালীন এই গদ্যকে বলতে ইচ্ছে করে মহনীয় অর্থে 'মেয়েলি' : যেন ললনাকুলের মৌখিক ভাষার গ্রাম্যতাদোষ নিষ্কাশিত ক'রে রবীন্দ্রনাথ ছেঁকে নিয়েছেন তার ঋজুতা, লাবণ্য ও সারল্য ; যা নিতান্ত প্রাকৃত, তারই উন্নয়নজনিত এই সম্মোহন পূর্ববর্তী 'ডাকঘরে'ও তিনি ঘটিয়েছিলেন। শুধু তাঁর লেখা প'ড়ে বাংলা গদ্যের সবগুলি সবীজ ধারাকে আমরা জানতে পারি, এবং ঐতিহাসিক ও অন্যান্য কারণে অন্য কোনো বাঙালি লেখক সম্বন্ধে এ-কথা বলা যায় না। আমাদের গদ্যের অবিকল দর্পণরূপে তাঁকে স্বীকার না-ক'রে আমাদের উপায় নেই।

যৌবনে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের অনুকরণ করেছেন, মধ্যবয়সে প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব তাঁকে স্পর্শ করে, এবং এ-দু'জন ছাড়া তাঁর সমকালীন বা পূর্বসূরির মধ্যে আর কেউ নেই, যাঁর সঙ্গে গদ্যশিল্পের দিক থেকে তাঁর তুলনা সম্ভব। সেইজন্য, যদি আমরা অন্বেষণ করি তাঁর 'বঙ্কিমী' গদ্য কোথায় বঙ্কিম থেকে স'রে এসেছে, আর তাঁর 'সবুজপত্র' যুগের রচনাই বা কোনদিক থেকে অ-প্রামথিক, তাহ'লে হয়তো ধরা পড়বে তাঁকে বাংলা গদ্যের স্রষ্টা বলার সংগত কারণ আছে কি না। সেই পার্থক্যটি, আমার মনে হয়, এই। বাংলা গদ্যে রমণীয়তা বঙ্কিমের দান, তাঁর আগে ঐ গুণটি দেখা দেয়নি, এবং তাঁর উপন্যাস ও 'কমলাকান্ত' প্রভৃতি প্রবন্ধ রমণীয় গদ্যে রচিত ব'লেই আজ পর্যন্ত অম্লান। কিন্তু এই রমণীয়তা পদ্যের অধমর্ণ। অর্থাৎ, বঙ্কিমের গদ্যে

মাঝে-মাঝেই পদ্যছন্দের বোল শোনা যায়, পদ্যের ধ্রুবপদের মতোই তাতে অনুলাপী অংশ অবিরল, তাঁর কোনো-কোনো বাক্য প্রায় পয়ারের পংক্তি হ'তে পারে—অন্ততপক্ষে মধ্যখণ্ডনে তাদের উন্মুখতা স্পষ্ট, এবং আঠারো-শতকী ইংরেজি দশমাত্রার পদ্যের মতো উক্তি ও প্রত্যুক্তির দোটানার মধ্যে তাদের অবস্থান। তাঁর বাক্যগুলি ঋজু, শিক্ষিত সৈন্যদলের মতো তারা তালে-তালে পা ফেলে চলে, তাদের শৃঙ্খলা ও পারম্পর্য যুক্তিনির্ভর, অভিপ্রায়ের ঐক্যের দ্বারা তারা সংবদ্ধ। এবং, সমগ্রভাবে দেখতে গেলে, প্রমথ চৌধুরীর চরিত্রলক্ষণও এই : বাক্যবন্ধের এই ঋজুতা, এই যুক্তিনির্ভর বাগনুক্রম। 'সাধু' ও 'চলিত' ভাষা-সম্পৃক্ত বাদানুবাদের ফলে এই সাদৃশ্যটি আমরা বহুদিন পর্যন্ত লক্ষ করিনি ; কিন্তু আজকের দিনে, যখন ঐ গৃহযুদ্ধ অবসিত হয়েছে, তখন 'লোকরহস্য' বা 'বিবিধ প্রবন্ধে'র পরে 'হাল-খাতা' বা 'নানা চর্চা' পড়লে সহজেই ধরা পড়ে যে এই দু-জনের গদ্যের চলন একই ধরনের, গঠনেও উল্লেখযোগ্য তফাৎ নেই। কিন্তু এঁদের পরে রবীন্দ্রনাথ খুললে তৎক্ষণাৎ এক ভিন্ন সুর ধ্বনিত হয় ; আমরা অনুভব করি আর-একটি গুণ যাকে দীপ্তি বা শৃঙ্খলা বা রমণীয়তা বললে যথেষ্ট হয় না, যাকে বলতে হয় প্রবাহ বা প্রবহমানতা—যা রবীন্দ্রনাথের পূর্বতন গদ্যে নেই, পরবর্তী সব গদ্যেও লক্ষণীয় নয়।

বঙ্কিমে, বা পূর্বসূরি বিদ্যাসাগরেও, গতি আছে ; কিন্তু যাকে আমি রবীন্দ্রনাথের প্রবাহ বলছি তা ভিন্ন প্রকৃতির ; এবং এই প্রভেদের আকার খুব বড়ো না-হ'লেও প্রকরণে তা দুরস্পর্শী। রবীন্দ্রনাথের গদ্যের যেটি কল্প বা ইউনিট সেটি বাক্য নয়, অনুচ্ছেদ ; একসঙ্গে এক-একটি অনুচ্ছেদে তিনি চিন্তা করেন, এবং অনুচ্ছেদগুলির যোগফলের চাইতে তাঁর সমগ্র রচনাটিকে বড়ো ব'লে মনে হয়। বাক্যের সঙ্গে বাক্যের, বা অনুচ্ছেদের সঙ্গে অনুচ্ছেদের সম্বন্ধের জন্য ব্যাকরণের বা যুক্তির যোগই যথেষ্ট, এবং তার দ্বারাও উৎকৃষ্ট গদ্য সম্ভব হ'য়ে থাকে ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথে সেই যোগসূত্রটি এমন এক রহস্যময় প্রাণস্পন্দন, যাকে আমরা অবশেষে ভাষার ধ্বনিস্পন্দন

ব'লেই চিনতে পারি। তাঁর বাক্যপর্যায় শুধু সান্নিধ্যগুণে প্রতিবাসী নয়, একটি অবিচ্ছেদী ধারাবাহিকতায় অন্যোন্যশ্লিষ্ট; তারা একে অন্যের অনুসরণ-মাত্র করে না, গড়িয়ে-গড়িয়ে পরস্পরকে যেন স্পর্শ ক'রে থাকে; জীবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো তারা নমনীয়, তারা লীলা জানে, ব্যত্যয় ঘটাতে ভয় করে না, মানসাম্য ভেঙে দিয়ে আশাতীতকে সম্ভব ক'রে তোলে। তাঁর একই রচনার মধ্যে নিঃসংকোচে পাশাপাশি স্থান ক'রে নেয় ক্ষুদ্র ও সরল, এবং জটিল ও দীর্ঘায়িত বাক্যবিন্যাস; তাঁর দুটি প্রতিবেশী বাক্য একই ভাবে আরম্ভ বা শেষ হয় না; স্বরান্ত ও হলন্ত শব্দের সন্নিবেশে তিনি যেন অচেতনভাবেই ব্যবধান রক্ষা ক'রে চলেন, একই স্বরের পৌনঃপুনিকতা সহ্য করেন না; দ্রুতি, বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্যের সাধনায় স্বীকার ক'রে নেন ইংরেজি ধরনের অন্বয়—যা তাঁর আগে বঙ্কিম ও বিদ্যাসাগরও করেছেন, কিন্তু পার্শ্বোক্তি, সর্বনাম ও ব্যুৎক্রমের ব্যবহারজনিত যার পূর্ণ রূপটি রবীন্দ্রনাথের আগে প্রতিভাত হয়নি, যদিও সমালোচকেরা তাঁকে ভুলে গিয়ে কখনো-কখনো এমনও বলেছেন যে কতিপয় অযোগ্য আধুনিক লেখকই বাংলা গদ্যে ইংরেজি রীতির প্রবর্তক। কিন্তু ইংরেজি তো আর নেই, সেটাই বিশুদ্ধ বাংলা হ'য়ে গেছে, কিংবা ধরনটাকে হয়তো ইংরেজি বলাই ভুল; কেননা কমা-সেমিকোলনাদি বিরতিচিহ্ন বাংলা গদ্য যেদিন স্বীকার ক'রে নিলে, সেদিনই ব'লে দেয়া যেতো যে, আপন প্রতিভার নির্বন্ধেই, সে বহুলাঙ্গ রূপকরণে অন্যান্য আধুনিক ভাষার প্রতিযোগী হ'য়ে উঠবে। অন্ততপক্ষে রবীন্দ্রনাথের পরে এ-কথা নিতান্ত অগ্রাহ্য যে এক-দাঁড়ি-দুই দাঁড়ি-নির্ভর কৃত্তিবাসী পয়ারের সঙ্গে বাংলা গদ্যের কোনো সম্বন্ধ আছে, কিংবা 'খাঁটি বাংলা অন্বয়' নামক অন্য কোনো পদার্থ আর সম্ভবপর। বরং আমাদের এ-কথাই তর্কাতীত ব'লে মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথের এই সমস্ত নূতনত্বের যা উৎস ও আশ্রয়, তা বাঙালির মুখের ভাষার নিজস্ব ও মৌলিক ছন্দ; যে-সুরে আমরা স্বাভাবিকভাবে কথা বলি, যে-ভাবে আমাদের কণ্ঠস্বরের উত্থান-পতন ঘ'টে থাকে—আমাদের আবেগ ও নৈরাশ্য, সংশয়,

উত্তেজনা ও দীর্ঘশ্বাস, এই সব-কিছুর এক আদর্শ ধ্বনিরূপের নামান্তর হ'লো রবীন্দ্রনাথের গদ্য। এবং এই যাকে ছন্দ বলছি তা পদ্যের নয়, গদ্যেরই ছন্দ, পারিভাষিক যাথার্থ্যের খাতিরে তাকে ছন্দস্পন্দ বলতে পারি; তাতে পদ্যের বা গানের মতো তাল নেই, কিন্তু রাগসংগীতে আলাপের মতো লয় আছে; রবীন্দ্রনাথের অসামান্য কৃতিত্ব এইখানে যে আজীবন কবির মতো গদ্য লিখেও, গদ্যে—এমনকি গদ্যকবিতায়—পদ্যছন্দের প্রতিধ্বনিকে তিনি স্থান দেননি। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত নির্ভুল বলেছেন যে তাঁর গদ্য 'মহাকবির গদ্য, সুতরাং কোথাও পদ্যগন্ধী নয়।' এই 'সুতরাং'টি অর্থময়।

৪

এই ছন্দোসিদ্ধির জন্যই রবীন্দ্রনাথের যুক্তি দুর্বল হ'লেও প্রবন্ধ ভেঙে পড়ে না, ঘটনাগত যাথার্থ্যের অভাবসত্ত্বেও উপন্যাস স্মরণীয় হয়, এবং নাটক অন্যান্য কারণে দুঃসহ বোধ হ'লেও উল্লেখযোগ্যতার মর্যাদা পায়। ব্যতিক্রম নেই তা নয়; 'নবীন', 'বাঁশরি' ও অংশত 'তিন সঙ্গী'র গদ্যকে কৃত্রিমতার পরাকাষ্ঠা বলতে আমি দ্বিধা করবো না; বাংলা ভাষার স্বাভাবিক ছন্দের উপর যাঁর স্বাভাবিক ঈশিত্ব ছিলো তিনি কেমন ক'রে ও-সব গ্রন্থ প্রণয়ন করতে পারলেন তা উত্তরপুরুষের সমস্যা হ'য়ে থাকবে। রবীন্দ্রনাথের যে-একটি লক্ষণ আমাদের অন্তহীনভাবে বিস্মিত ক'রে রেখেছে তা তাঁর আপতিক স্বতঃস্ফূর্তি; ক্লান্ত মুহূর্তে তিনি বরং নিজের অনুকরণ করেছেন কিন্তু চেষ্টাকৃত নূতনত্ব ঘটাতে চাননি; আর সেইজন্যই 'বাঁশরি' বা 'তিন সঙ্গী'কে অমন চরিত্রচ্যুত মনে হয়, তাতে পদে-পদে পাঠককে চমকে দেবার যে-প্রয়াস আছে তা ক্লিষ্ট ও ক্লেশকর ব'লেই গভীরতম অর্থে অ-রাবীন্দ্রিক। অথচ প্রায় একই সময়ে রচিত 'বিশ্বপরিচয়' ও 'ছেলেবেলা'তে গদ্যভঙ্গির একই প্রকার নূতনত্ব থাকলেও কৃত্রিমতার নিপীড়ন নেই; তার কারণ আমার এই মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের সন্ততন ভাষা ব্যবহার করলে মানিয়ে যায়, কিন্তু গল্প-নাটকের পাত্রপাত্রীর মুখে তা অবিশ্বাস্য। কাল্পনিক

চরিত্রের মুখে চরিত্রশোভন ভাষা বসাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ অনেক সময়ই ব্যর্থ হয়েছেন, নাটকরচনায় এইটেই তাঁর বিঘ্ন ছিলো ; 'ডাকঘরে'র ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে তা প্রকট হয়নি, কিন্তু 'রাজা' থেকে 'রক্তকরবী' পর্যন্ত যেখানেই আছে জনতা বা প্রাকৃতজন সেখানেই তাদের কথা শুনে আমাদের সন্দেহ হয় যে এদের কোনো নিজস্ব সত্তা নেই, এরা কর্তার হাতের ক্রীড়নক মাত্র। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের গদ্য সবচেয়ে প্রামাণিক ও স্বচ্ছন্দ হ'য়ে ওঠে, যখন তিনি নিজের জবানিতে কথা বলতে পারেন ; তাই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনার মধ্যে অবশ্যমান্য তাঁর 'গল্পগুচ্ছ', তাঁর উপন্যাসের বর্ণনার অংশ, এবং তাঁর প্রবন্ধপর্যায়, চিঠিপত্র ও আত্মজৈবনিক রচনাবলি। অন্তত এগুলো থেকে বাছাই ক'রে নিলে আমরা গদ্যশিল্পী রবীন্দ্রনাথের প্রকৃষ্ট পরিচয় পেতে পারি।

প্রবন্ধরচনার একটি গতানুগতিক পদ্ধতির সঙ্গে আমরা পরিচিত আছি : মাষ্টার মশাই ছাত্রকে বলেন, অমুক-অমুক পুস্তক পাঠ ক'রে এই বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে আনো ; এবং ছাত্র যদি প্রমাণ করতে পারে যে উল্লিখিত বই ক-টি সে পড়েছে, প'ড়ে অন্তত অংশত বুঝেছে, এবং সেই বোধটুকু তার 'স্বীয় ভাষা'য় প্রকাশ করতেও অপারগ হয়নি, তাহ'লেই সে পয়লানম্বরি ছাত্র ব'লে গণ্য হ'লো। আমরা ধ'রে নিতে পারি যে উত্তরজীবনে নিজে অধ্যাপক হ'য়ে সে এই পদ্ধতির ব্যাপকতর ব্যবহার করবে, শতাধিক পুস্তক অধ্যয়ন ক'রে রচনা করবে নূতন গ্রন্থ, তার অধ্যবসায়ের ফলে কোনো-একটি সীমিত বিষয়ে আমাদের জ্ঞান বর্ধিত হবে। সম্ভবত সেই বিষয়টি হবে অ-সামান্য, অর্থাৎ সাধারণ সাহিত্যলিপ্সুর পক্ষে মনোজ্ঞ নয়, কিন্তু বিশেষজ্ঞের আদরণীয়। এ-ধরনের পুস্তক তার নিজের ক্ষেত্রে মূল্যবান, কিন্তু ততদিনই মূল্যবান যতদিন সেই বিশেষ বিষয়টিতে নূতনতর জ্ঞান সংকলিত না হয়। কিন্তু প্রবন্ধরচনার অন্য একটি উপায় আছে, সেই উপায় প্রতিভাবানের। কোনো-এক শুভ মুহূর্তে লেখক তাঁর স্বজ্ঞার দ্বারা অকস্মাৎ একটি সত্যকে অনুভব করেন—সেটা 'সত্য' কিনা তাও সঠিকভাবে বলা যায় না, শুধু এটুকু বলা যায় যে তাঁর অনুভূতিটা সত্য। সেইটিকে প্রকাশ করার জন্য যে-সব তথ্য,

যুক্তি ও উদাহরণ তিনি উপস্থিত করেন, সেগুলিও নির্ধারিত বা সুচিন্তিতভাবে আহরিত নয়, তাঁর উৎসাহের তাপে যা-কিছু মনে প'ড়ে যায় প্রায় তা-ই তিনি নির্বিচারে গ্রহণ ক'রে থাকেন। এই ধরনের প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য এই যে যুক্তি অথবা তথ্যে ভ্রান্তি ধরা পড়লেও রচনাটি অনাহত থাকে, কেননা তাদের মৌলিক অনুভূতিটি প্রমাণনির্ভর নয়, সংক্রামক, অতএব চিরকালই মূল্যবান। উদাহরণত, রবীন্দ্রনাথের 'ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের ধারা' নামক প্রবন্ধটির উল্লেখ করতে পারি ; আজকের দিনে তার প্রতিটি তথ্য যদি পণ্ডিতেরা বাতিল ক'রে দেন তবু সেটিকে বর্জন করতে পারবো না আমরা, ভারতবর্ষীয় সভ্যতা বিষয়ে লেখকের দৃষ্টি আমাদের মুগ্ধ ক'রে রাখবে। এবং এই দৃষ্টি এ-অর্থে সত্য যে কোনো-এক সময়ে কোনো-এক পুরুষ তার প্রভাবে ভারতের একটি সমগ্র রূপ উপলব্ধি করেছিলেন। যেখানে উপলব্ধি আছে সেখানে আমরা তর্ক করতে ভুলে যাই।

এই ধরনের সমালোচনাকে বিম্বধর্মী বা ইম্প্রেশনিষ্টিক আখ্যা দিয়ে অনেকে এর মর্যাদালাঘবের চেষ্টা ক'রে থাকেন। কিন্তু এখানে প্রশ্ন তোলা উচিত : বিম্বটি কার মনে প্রতিভাত হচ্ছে? তা যদি হন কোনো সমকালীন সাপ্তাহিকের লেখক, যিনি পাঠকের সঙ্গে পাঁচ মিনিক গালগল্প ক'রে প্রসঙ্গত জানিয়ে দিতে ভোলেন না যে কোনো-একটি বই প'ড়ে তাঁর 'কেমন লাগলো', তাহ'লে এ-বিষয়ে আলোচনার কোনো প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু যদি তা হন কোনো আলাপচারী স্যামুয়েল জনসন, বা বৃদ্ধ গ্যেটে, বা সদ্যযুবক জন কীটস, বা বোদলেয়ার অথবা টোমাস মান্—কিংবা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাহ'লে এই তথাকথিত বিম্বকে আর অশ্রদ্ধা করার উপায় থাকে না ; আমরা দেখতে পাই যে কোনো-একটি ভাব, তাঁদের মনে বিম্বিত হয়েছে ব'লেই, ব্যঞ্জনায় গাঢ় হ'য়ে উঠেছে ; এঁদের একটি অসতর্ক মুহূর্তের মুখের কথা, বা দ্রুতরচিত পত্রের কোনো উক্তি—কখনো-কখনো তাও যেন অর্থে ও ইঙ্গিতে সসত্ত্ব। এর পরে আমাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও মানতেই হয় যে ভগবানের রাজ্যে সুবিচার ব'লে কিছু নেই ; যে প্রতিভা নামক রহস্যময় ব্যাপারটি অন্যায়ভাবে

আমাদের উপর জিতে যায়—নির্দিষ্ট শাস্ত্রসমূহ না-প'ড়েও, বয়সে প্রায় নাবালক হ'য়েও, এমনকি আলোচ্য বিষয়টিতে অত্যল্প জ্ঞান নিয়েও—সাবলীলভাবে আমাদের উপর জিতে যায়। যাঁরা নিজেরা সৃষ্টিশীল প্রতিভাবান লেখক তাঁরা সাহিত্য বা আনুষঙ্গিক বিষয়ে যা বলেন তার মূল্য স্বতঃসিদ্ধ বললে ভুল হয় না ; কেননা আমরা দেখতে পাই যে পণ্ডিতেরা যুগে-যুগে তাঁদের উক্তির ভাষ্য রচনা করেন, কিন্তু পণ্ডিতের গবেষণার সঙ্গে পরিচয়স্থাপন কবিদের পক্ষে প্রয়োজনীয় হয় না।

কবি-সমালোচকের মন কী-ভাবে কাজ করে, আমাদের ভাষায় রবীন্দ্রনাথ তার অতুলনীয় নিদর্শন। তাঁর প্রবন্ধে উপমার প্রাচুর্য দেখে কেউ-কেউ বলেছেন যে তিনি স্থানে-অস্থানে অকারণ 'কবিত্ব' ক'রে থাকেন। এ-কথাটা ঠিক নয় ; আমাদের স্মর্তব্য যে উপমা ভিন্ন দর্শনশাস্ত্র অচল, উপনিষদ ও প্লেটো থেকে আরম্ভ ক'রে তার উদাহরণ অপর্যাপ্ত। বরং এটাই লক্ষণীয় যে রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রবন্ধ রীতিমতো তাত্ত্বিক ভাষায় রচিত, যাকে গদ্যতম গদ্য বলা যায় তাও তিনি অনেক লিখেছেন ; বস্তুত, 'সবুজপত্রে'র আগে পর্যন্ত প্রবন্ধে বা কথাসাহিত্যে তাঁর কবিসত্তা সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পায়নি। অথচ তাঁর যে-কোনো পর্যায়ের রচনায় আমরা একজন কবির উপস্থিতি অনুভব করি ; তার কারণ তাঁর মনের বিদ্যুৎধর্মিতা। যেন বিদ্যুতের উদ্ভাসের মতো তিনি মুহূর্তে তাঁর মূল চিন্তাটিকে আমাদের মনের সামনে উপস্থিত করেন : আলোচ্য বিষয় যা-ই হোক না, রাজনীতি বা ধর্ম, শিক্ষা বা ইতিহাস, তিনি তৎক্ষণাৎ বিষয়টির একেবারে মর্মস্থলে চ'লে যান ; পাঠকদের মধ্যে যাঁরা বিশেষজ্ঞ তাঁরা নতুন কোনো তথ্য না-পেলেও নতুন একটি দৃষ্টি লাভ করেন ; আর যাঁরা তাঁর সঙ্গে একমত হ'তে পারেন না তাঁরা দেখতে পান যে তাঁদের স্বমতের সপক্ষে নতুন যুক্তি ঐ রচনা থেকেই আহরণ করা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ সেই দ্রষ্টাদের অন্যতম যাঁরা বুঝিয়ে দেন আমরা যাকে 'মতামত' বলি সেটি সবচেয়ে অকিঞ্চিৎকর সামগ্রী ; আসল কথা অন্তর্দৃষ্টি—সেই 'বিম্ব' বা বিম্বগ্রহণের সহজ ক্ষমতা, যা বিষয় ও বিষয়ীকে

যুগপৎ উদ্‌ঘাটিত করে। যেহেতু রবীন্দ্রনাথ একজন অত্যন্ত ঔৎসুক্যজনক ব্যক্তি, তাই তিনি যে-কোনো বিষয়ে যা-কিছু বলেন প্রায় তাতেই আমাদের ঔৎসুক্য অনিবার্য।

এখানে বলা দরকার যে তাঁর সাহিত্য ও রসতত্ত্বের আলোচনায় আমরা প্রথম থেকেই একটি ভিন্ন সুর লক্ষ করি ; এখানে তাঁর কবিসত্তার কাজ বেশি, উপমা আরো প্রচুর, মীমাংসা আরো অনিশ্চিত, এবং উপস্থাপনা—শাস্ত্রীয় আদর্শে দেখলে—সবচেয়ে কম তৃপ্তিকর। তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য সমালোচনা-গ্রন্থ 'পঞ্চভূত' সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত হ'তে পারি না এটি 'সমালোচনা' না কি 'বিচিত্র' বিভাগে অঙ্গীকারযোগ্য ; এদিকে 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র নামেই যদিও 'বিচিত্র' আছে, তবু সেটিকে অনেকাংশে রসতত্ত্বের বিচার বললে ভুল হয় না—বিখ্যাত 'কেকাধ্বনি' প্রবন্ধ তো রীতিমতো নন্দনতত্ত্বের অনুশীলন। পরবর্তী গ্রন্থগুলিকে 'প্রাচীন সাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য', 'সাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে', এই ধরনের সুস্পষ্ট নাম দিয়ে তিনি পাঠক, সম্পাদক, ছাত্র ও অধ্যাপকের সুবিধে ক'রে দিয়েছেন, কিন্তু এখানেও তাঁর লেখার ধরনে 'শোনো, বলছি' ভাবটা নেই, নিজেকে সত্য ও জ্ঞানের ভাণ্ডার ব'লে ধ'রে নিয়ে পাঠককে শিক্ষিত করার ভঙ্গি নয় তাঁর ; যেমন 'পঞ্চভূতে' ভিন্ন-ভিন্ন 'চরিত্রে'র সাহায্যে ভিন্ন-ভিন্ন দৃষ্টিকোণ উপস্থিত করেছিলেন, তেমনি এখানেও যেন নিজের সঙ্গে তর্ক করতে-করতে তাঁর যাত্রা ; একটু এগিয়ে, আর-একটু পেছিয়ে, মাঝে-মাঝে হুঁচট খেয়ে, কখনো কোনো আকস্মিক ও উজ্জ্বল ভাবনার পশ্চাদ্ধাবন ক'রে, কখনো বা দূরকল্পনার উৎসাহে আলোচ্য বিষয় বিস্মৃত হ'য়ে—এমনভাবে লেখেন যেন সমস্ত ব্যাপারটা তাঁর আত্ম-পরীক্ষা ও স্বগতোক্তি। যেমন কবিতায়, তেমনি প্রবন্ধরচনায় অনেক সময় আচ্ছাদনের ব্যবহার উপকারী হয় ; সাহিত্য বিষয়ে কিছু বলার থাকলে তার একটি প্রশস্ত উপায় হ'লো বিশেষ কোনো কবি অথবা গ্রন্থের সমীক্ষণ, সেই অবলম্বনটিকে জড়িয়ে-জড়িয়ে লেখকের চিন্তা উন্মীল হ'তে পারে—এবং কবিরা সাধারণত এইভাবেই সমালোচনা লিখে থাকেন। রবীন্দ্রনাথেও এর উদাহরণের অভাব নেই, কিন্তু

'সাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে' ও সর্বশেষ 'সাহিত্যের স্বরূপ'—এই তিনটি গ্রন্থে বিশুদ্ধ রকম তাত্ত্বিক বা দার্শনিক আলোচনার দিকে তাঁর প্রবণতা দেখি; 'সাহিত্যের তাৎপর্য', 'সাহিত্যের সামগ্রী', 'সৌন্দর্যবোধ', 'সাহিত্যবিচার', 'সাহিত্যধর্ম', 'তথ্য ও সত্য'—এই সব শিরোনামা, মানতেই হবে, প্রথম দর্শনে তেমন উৎসাহজনক নয়; আমাদের মনে হ'তে পারে যিনি 'সাহিত্য', 'সত্য' বা 'সৌন্দর্য' বিষয়ে তাঁর ধারণাটি বেশ স্পষ্ট কথায় ব'লে দিতে পারেন তিনি আর যা-ই হোন, কবি নন, এবং রবীন্দ্রনাথ কেমন ক'রে এই বিমূর্ত বায়ুমার্গে বিচরণ করেছিলেন তা ভেবে আমাদের বিস্মিত হওয়াও স্বাভাবিক। কিছুটা বেদনার সঙ্গে আমাদের মনে প'ড়ে যায় যে ততদিনে এই কবি তাঁর দেশের প্রধান পুরুষরূপে অধিষ্ঠিত হয়েছেন; যে-কোনো প্রশ্ন তাঁর সামনে উপস্থিত করতে লোকেরা যেমন আর সংকোচ করে না, তেমনি তাদের সন্তোষ-সাধনের চেষ্টাও তাঁর কর্তব্য-তালিকার অন্তর্ভূত; এমনকি, 'কবিতা কাকে বলে' এই রকমের অসম্ভব প্রশ্ন উত্থাপিত হ'লেও তাঁর মৌন থাকার উপায় নেই। পক্ষান্তরে, এমন সম্ভাবনাও স্বীকার্য যে জীবনের প্রধান সৃষ্টিশীল অধ্যায় উত্তীর্ণ হবার পর, এবং তাঁর 'বিরুদ্ধে' একদল অর্বাচীনের কলরব শুনতে পেয়ে, তিনি তাঁর অচেতন সাহিত্যধর্মকে সচেতন স্তরে ব্যক্ত করার চেষ্টা করছিলেন; হয়তো তাঁর সাহিত্যিক আদর্শ ও বিশ্বাস সম্পর্কে নিজেরই কাছে একটা জবানবন্দি দেবার ইচ্ছে তাঁর হয়েছিলো। এই প্রচেষ্টা বিপজ্জনক, কেননা কোনো তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার মধ্যে কবি তাঁর কবিতাকে ধরাতে পারেন না; তত্ত্বকে আঁটো করতে গেলে বস্তা ফেটে ধানের আঁটি বেরিয়ে পড়ে, আবার উদার হ'তে গেলে তা সর্বসাহিত্যের নির্বিশেষ আধার হ'য়ে যায়। এ-অবস্থায় কবিরা একমাত্র যা করতে পারেন রবীন্দ্রনাথও তা-ই করেছেন: আরিস্টটল বা আলঙ্কারিকদের মতো বিষয়টিকে মুখোমুখি আক্রমণ না-ক'রে সেটিকে ঘিরে-ঘিরে কথা বলেছেন তিনি; তাঁর রচনার মধ্যে প্রবেশ করেছে সংশয়, কৌতুক, পুনরুক্তি, অস্থিরতা; কোনো-একটি উক্তি ক'রে তখনই তাকে সীমিত, খণ্ডিত বা বিস্তারিত করেছেন; কোনো প্রবন্ধ শেষ করামাত্র

সেটিকে আর পর্যাপ্ত ব'লে তাঁর মনে হয়নি—তারই জের টেনে, তার প্রতিবাদে ও সমর্থনে, আরো লিখতে হয়েছে। সেইজন্য তাঁর তত্ত্বালোচনা এমন সপ্রাণ ও উর্মিল, তাকে আমরা বলতে পারি একটি আন্দোলন: 'অলি বার-বার ফিরে যায়, অলি বার-বার ফিরে আসে'—লেখকের সঙ্গে বিষয়ের সম্বন্ধটি যেন এইরকম, তা না-হ'লে যে ফুল ফোটে না। এই 'ফুল' হ'লো রবীন্দ্রনাথের দু-একটি তীব্র ও সহজাত অনুভূতি, তাঁর হৃদয়ের মধ্যে অনির্বচনীয়ের উদ্ভাস; সেটি কোনো প্রমাণসাপেক্ষ তথ্য নয় ব'লে উপমা, রূপক ও অলিধর্মী হিল্লোল ভিন্ন তার সঙ্গে ব্যবহারের কোনো পথ নেই। তা নেই ব'লে তাঁর সব তর্ক গান হ'য়ে ওঠে—'ঘরে বাইরে'র বিমলার কথা চুরি ক'রে বলছি; কিংবা এর চেয়েও সঠিক বর্ণনা যদি দিতে চাই তাও রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই পাওয়া যাবে। 'ছন্দ' গ্রন্থের আরম্ভে 'সই, কেবা শুনাইল শ্যামনাম', এই পংক্তি উদ্ধৃত ক'রে তিনি মন্তব্য করছেন যে এই সাধারণ সংবাদটিকে ছন্দের মধ্যে এমনভাবে দুলিয়ে দেয়া হয়েছে যে পাঠকের মনে 'কেবলই ঢেউ উঠতে লাগলো। ঐ কটি কথার···অন্তরের স্পন্দন আর কোনোদিনই শান্ত হবে না। ওরা অস্থির হয়েছে, এবং অস্থির করাই ওদের কাজ।' পদ্যছন্দের এই ইন্দ্রজাল আমাদের কারোরই অজানা নেই; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের গদ্যের অভিঘাতে কখনো-কখনো অমনি ক'রেই অভিভূত হ'তে হয়, আমাদের মনের মধ্যে 'কেবলই ঢেউ উঠতে থাকে,' কথা শেষ হ'লেও স্পন্দন থামে না। আরো আশ্চর্য এই যে তাঁর এই কিন্নরকণ্ঠ আমরা সেখানেও শুনতে পাই যেখানে বিষয়টি বৈজ্ঞানিক; বরং সেখানেই যেন নির্ভুলভাবে শুনতে পাই; তাঁর ছন্দ ও শব্দতত্ত্বের আলোচনা শুধু আমাদের বুদ্ধির কাছে বার্তা পাঠায় না, আমাদের সমগ্র সত্তাকে পুলকিত ক'রে তোলে। হয়তো কোনো মীমাংসার তীরে তিনি উত্তীর্ণ করেন না আমাদের, কোনো তৈরি সত্য কখনোই হাতে তুলে দেন না; কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে একটি বেগসঞ্চার করেন, যার ফলে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসে আমাদের নিজেদের ভ্রষ্ট স্মৃতি, স্বপ্নের ভগ্নাংশ, চিন্তার

রশ্মি, হয়তো ইন্দ্রিয়ের কোনো নূতন শিহরণ। আমরা চঞ্চল হ'য়ে উঠি, ভেলা নিয়ে ভেসে পড়ি সমুদ্রে ; তিনি আমাদের স্বাধীনভাবে সত্যানুসরণে যাত্রা করিয়ে দেন—এই তিনি করেন আমাদের—যদি আমরা নিজেদের অক্ষমতাবশত মধ্যসমুদ্রে ডুবে মরি, সে-দায়িত্ব তাঁর নয়, আর যদি-বা তাঁর হয় তবু তো মানতে হবে যে বেরিয়ে প'ড়েই আমরা সার্থক হয়েছি। 'ওরা অস্থির হয়েছে, এবং অস্থির করাই ওদের কাজ' : তাঁর প্রবন্ধসংগ্রহের মুখ-পত্রে এই কথাটি উদ্ধৃতিযোগ্য।

৫

রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনাকে অন্য এক ভাবে ভাগ করা যায় : একদিকে সরকারি বা পোশাকি, অন্য দিকে ঘরোয়া বা আটপৌরে। এই বিভাগ তাঁর প্রবন্ধের পক্ষেও অর্থহীন নয়, কিন্তু পত্রাবলি ও ভ্রমণবৃত্তান্ত বিষয়ে আক্ষরিকভাবে প্রয়োজ্য। পত্রাবলিকে বাদ দিয়ে তাঁর গদ্যসাহিত্য বিষয়ে চিন্তা করা যায় না, কেননা তা শুধু পরিমাণে অজস্র নয়, কখনো-কখনো সাহিত্যগুণে ভরপুর। কিন্তু যেগুলো তাঁর সত্যকার চিঠি, এবং সেই সঙ্গে স্মরণীয় সাহিত্য, সেগুলো সবই তাঁর যৌবনের রচনা ; যেদিন থেকে শান্তিনিকেতনের গুরুদেব ও জগতের গুরু-স্থানীয় হবার দুর্ভাগ্য তাঁর ঘটলো, সেদিন থেকে চিঠি লেখার সুযোগ তিনি হারালেন ; তাঁর জীবনের শেষ কুড়ি বা পঁচিশ বছরে তিনি পত্রাকারে যা-কিছু লিখেছেন তার শ্রেষ্ঠ অংশ পত্রবেশী প্রবন্ধ, বা অন্তত প্রকাশের জন্যই রচিত ; অন্যগুলো অনুরোধরক্ষার্থে বা কর্তব্যবোধে লেখা, তাতে কখনো কোনো মহিলাকে তিনি সান্ত্বনা বা উপদেশ দিচ্ছেন, কখনো বা সমকালীন পুস্তক বা ঘটনা বিষয়ে তাঁকে কিছুটা অনিচ্ছা কাটিয়ে অভিমত দিতে হচ্ছে। শেষের দিকে তাঁর প্রতিটি চিঠির প্রতিলিপি রেখে তবে তা ডাকে পাঠানো হ'তো ; চিঠির স্বাচ্ছন্দ্যের পক্ষে এত বড়ো বিঘ্ন আর নেই ; তাঁর এই পর্যায়ের চিঠিপত্র সাধারণত এমন অব্যক্তিক যে প্রায় যে-কোনোটি যে-কোনো ব্যক্তিকে পাঠিয়ে দিলে অশোভন হ'তো না। অথচ এই অবস্থাতেও, তিনি নিতান্তই রবীন্দ্রনাথ

ব'লে, অনেক পত্রে অল্পবিস্তর সরসতার তিনি সঞ্চার করেছেন, তাঁর হাতের গুণে খুচরো খবরের চিরকুটও স্বাদু হয়েছে, কাজের কথাও প্রয়োজনের মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি। যাকে বলে গুণপনা বা দক্ষতা তা যেন তাঁর নয়নহরণ হস্তাক্ষরের মতোই তাঁর সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হ'য়ে গিয়েছিলো ; তা দেখে তাঁকে ধন্য না-ব'লে যেমন পারি না, তেমনি আমাদের দীর্ঘশ্বাস পড়ে সেই স্বর্ণযুগ স্মরণ ক'রে, যখন পত্রলেখক ও প্রাপকের মধ্যে মুদ্রাকরের উপচ্ছায়া হানা দেয়নি। সেই যুগের একটি শ্রেষ্ঠ ফসল 'ছিন্নপত্র'—অমর কাব্য 'সোনার তরী' ও 'গল্পগুচ্ছ'কে মনে রেখেই এ-কথা বলছি : অমন প্রাণোচ্ছল, যুগপৎ অমন ব্যক্তিগত ও সার্বিক, অমন চিরনতুন ও অফুরন্তরূপে পাঠযোগ্য পত্রপর্যায় রবীন্দ্রনাথও আর দ্বিতীয়বার রচনা করেননি। কল্পনা, হাস্যরস, মনস্বিতা ; অনুচিন্তনের আবিষ্কার ও বহির্জগতের বাস্তব তথ্য ; চোখ দিয়ে দেখা ও মনে-মনে ভাবা ;—এই সবই আছে 'ছিন্নপত্রে', আর সেই সঙ্গে আছে আর-একটি ব্যাপ্ত সত্তা, যার নাম বাংলাদেশ ছাড়া আর কিছুই দিতে পারি না। ঋতু, নদী ও তৃণতরুময় বাংলার পল্লীপ্রকৃতি, তার কান্তি, গন্ধ ও আর্দ্রতা নিয়ে, এই পুস্তকের অক্ষর থেকে এমনভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যে 'ছিন্নপত্র' নামটি উচ্চারণ করলেই বাংলাদেশের একটি মানসমূর্তি আমরা দেখতে পাই। এবং এগুলো খাঁটি চিঠি, বস্তুতই বন্ধু বা আত্মীয়ের কাছে বার্তাপ্রেরণ, এখানে সচেতন শিল্পিতার কোনো চেষ্টা ছিলো না, লেখার পরে রবীন্দ্রনাথ ভুলেও গিয়েছিলেন। তাঁর স্বতঃস্ফূর্তি একান্তভাবে জয়ী এখানে।

অপরিচিত বা স্বল্প-পরিচিত ভক্তের কাছে আত্ম-উদ্‌ঘাটন রিলকের পক্ষে যেমন সহজ ছিলো, তেমনি ছিলো রবীন্দ্রনাথের স্বভাববিরোধী ; আমরা দেখতে পাই তাঁর যে-কোনো পর্যায়ের প্রকৃষ্ট চিঠি কোনো নিকট আত্মীয় বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে লেখা হয়েছিলো। সতেরো বছর বয়সে, প্রথমবার বিলেতে গিয়ে, তিনি যে-ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখেন সেটিকে গদ্যসাহিত্যে তাঁর প্রতিভার প্রথম স্বাক্ষর বলা যায় ; 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র', তৎকালে সাময়িক পত্রে ছাপা হ'য়ে থাকলেও, প্রকাশের জন্যই লেখা হয়নি ; জোড়াসাঁকোবাসী আত্মীয়দের

উদ্দেশে যথার্থই চিঠি লিখেছিলেন ব'লে তাতে সেই অন্তরঙ্গতা ধ্বনিত হয়েছে, যা পরে আমরা 'ছিন্নপত্রে' ও 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি'তে পাই, কিন্তু পরবর্তী ভ্রমণগ্রন্থ ও পত্রাবলিতে যা বিলীয়মান। এই পুস্তকত্রয় প্রমাণ করে যে যে-কালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সরকারি' সাহিত্য 'সাধু'ভাষায় লিখছিলেন সে-কালেই, প্রমথ চৌধুরীর বহু পূর্বে, তাঁর 'ঘরোয়া' সাহিত্যে 'চলিত' ভাষা স্রোতস্বিনী হ'য়ে উঠেছিলো; অতখানি স্বভাবনৈপুণ্য সত্ত্বেও কেন যে তিনি 'সবুজপত্রে'র পূর্বযুগে চলিত ভাষার প্রকাশ্য ব্যবহারে কুণ্ঠিত ছিলেন, আমরা তা ভেবে অবাক না-হ'য়ে পারি না।

উত্তরযৌবনে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু কেউ ছিলেন না, ছিলো এক বিরাট ভক্তসম্প্রদায়, সৌরকেন্দ্রিক বহু মণ্ডলে বিভক্ত। ততদিনে তাঁর ব্যক্তিজীবনে বহু পরিবর্তন ঘটেছে; পত্নী এবং দুই পুত্রকন্যা মৃত; যৌবনের বন্ধু বা পরিবারভুক্ত ঘনিষ্ঠেরা মৃত অথবা ছিন্নযোগ; বাংলাদেশে কেউ নেই যাঁকে তিনি সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করতে পারেন; সম্রাট তিনি বাংলা সাহিত্যের, জগতের চোখে প্রাচীর প্রতিভূ, ইংরেজ-শাসিত নিখিলভারতের আত্মমর্যাদার প্রতীক, এবং পূর্বে পশ্চিমে নিরন্তর ভ্রাম্যমাণ। তৎকালীন পত্রে ও প্রবন্ধে এই সবই প্রতিফলিত হয়েছে। উপরন্তু, এই সময়েই গদ্যরীতি নিয়ে ক্লান্তিহীন পরীক্ষায় তাঁকে প্রবৃত্ত দেখি; তাঁর জীবনের শেষ কুড়ি বছরের গদ্যে যত নূতন ও নূতনতর ভঙ্গি দেখা যায় পূর্বতন চল্লিশ বছরের রচনায় সে-তুলনায় প্রায় কিছুই নেই; যদিও চলিতভাষাকে আগেই একান্তভাবে মেনে নিয়েছিলেন, গদ্যশিল্পে সচেতন পরীক্ষার 'লিপিকা'তেই আরম্ভ। যা কোনোরকমেই পদ্য নয়, গদ্য-পদ্যের মাঝামাঝি জায়গায় অব্যবস্থিতভাবে প'ড়েও নেই, যা নির্ভুলভাবে গদ্য এবং নির্ভুলভাবে ছন্দস্পন্দিত, এই ধরনের রচনাপর্যায় তাঁর অন্ত্যজীবনের প্রধান অবদান। 'লিপিকা'য় তৃপ্ত না-হ'য়ে 'পুনশ্চ' লিখলেন; তারপর তিনটি নৃত্যনাট্যে গদ্যকবিতার নূতন রূপকল্প; 'শেষের কবিতা' থেকে 'মালঞ্চ' পর্যন্ত উপন্যাস; অবশেষে 'ছেলেবেলা', 'সহজ পাঠ', 'গল্পসল্প'। তুল্যমূল্য নয় এরা, কিংবা আমি এমন কথাও বলতে চাচ্ছি না যে সামগ্রিক

বিচারে এই পর্যায় পূর্বরচনার চেয়ে উৎকৃষ্ট; কিন্তু এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে এই রচনাধারার মধ্য দিয়ে গদ্যশিল্পের এক ত্বরান্বিত বিচিত্র বিকাশ সম্ভব হয়েছে; বিশেষ অর্থে আধুনিক বলতে পারি এমন বাংলা গদ্যের এরা প্রবর্তক ও বিবর্তক। গদ্যের প্রতি বৃদ্ধ কবির এই নিবিড় মনোযোগের একটি কারণ নিশ্চয়ই এই যে সাধুভাষার তুলনায় চলিত ভাষা অনেক বেশি নম্য, তাতে লীলা ও ভঙ্গিবৈচিত্র্যের অবকাশ রবীন্দ্রনাথের কানে ও মনে অমোঘভাবে ধরা পড়েছিলো; এবং যৌবনে যেমন বাংলা পদ্যের প্রতিটি সম্ভবপর ছন্দকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন, তেমনি প্রৌঢ়জীবনে গদ্যের ধ্বনিমাধুরীকে নানা রূপে উদ্ভাবন না-ক'রে পারেননি। অন্য কারণ হয়তো এই যে তিনি ভিতরের দিক থেকে ক্লান্ত হয়েছিলেন; বলার কথা আর ছিলো না ব'লে স্টাইল তাঁর অবলম্বন হ'য়ে উঠলো। তিনটি নৃত্যনাট্যের মধ্যে দুটিরই কাহিনীর অংশ তাঁর নিজের পূর্বরচনা থেকে আহরিত; 'ছেলেবেলা'য় নতুন কোনো উপাদান নেই; 'রাজা ও রানী'র রূপান্তর হ'লো 'তপতী'; 'রাজা'র, 'শাপমোচন'; 'একটি আষাঢ়ে গল্পে'র, 'তাসের দেশ', ও 'পূজারিনী' কবিতার, 'নটীর পূজা'। নৃত্য, সংগীত ও অভিনয়ের আবেদন থেকে চ্যুত ক'রে দেখলেও, শুধু পঠনীয় পুস্তক হিশেবে, এই সব পুনর্লিখনের মর্যাদা যে অনস্বীকার্য তার কারণই এদের গদ্যরীতির কারুকর্মিতা।

এই পর্যায়ের ভ্রমণগ্রন্থের প্রধান লক্ষণ এই যে রবীন্দ্রনাথ কখনো ভুলতে পারছেন না তিনি রবীন্দ্রনাথ, 'কুষ্মাণ্ডের ভার' বহন ক'রে পৃথিবীতে বেরিয়েছেন। যেমন এককালে সর্ব ইন্দ্রিয় দিয়ে বাংলাদেশ ও ইংলণ্ডকে অন্তঃস্থ করেছিলেন, জাপান, রাশিয়া বা দক্ষিণ আমেরিকার সঙ্গে তেমন ব্যবহার আর নেই তাঁর; তাঁর চক্ষু আর তথ্য ছাখে না, ঘ্রাণেন্দ্রিয় শুধু পূর্বপরিচিত জুঁইফুলে সাড়া দেয়; নূতন দেশের কোনো দৃশ্য বা আবহ আর সৃষ্টি করেন না আমাদের জন্য। স্বদেশের সঙ্গে অন্যান্য দেশের তুলনায় তিনি ব্যাপৃত; স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধির চিন্তায় আচ্ছন্ন তাঁর মন; বিচার, বিতর্ক ও বিশ্লেষণে তিনি এতদূর পর্যন্ত নিযুক্ত যে 'রাশিয়ার চিঠি' প্রায় একটি রাজ-

নৈতিক নিবন্ধ হ'য়ে উঠলো। অথচ প্রতিটি পুস্তকে গদ্য এমন বেগবান ও দ্যুতিময় যে তার প্রভাব তাত্ত্বিক মূল্যকে ছাপিয়ে পড়ে; সামাজিক, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক কারণে যা পাঠযোগ্য তা শিল্পগুণে স্মরণীয়তার মূল্য পায়। আমার এই কথার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'যাত্রী'; তার ভাবগম্ভীর স্বগতোক্তির মধ্যে জ্ঞানের কথা যা আছে তা অন্য লেখকও শোনাতে পারেন, কিন্তু সুন্দরের সান্নিধ্যলাভে যে-আনন্দ পাই তা রবীন্দ্রনাথেরই নিজস্ব দান। এবং, কোনো বিষয়ব্যতিরেকে, শুধুমাত্র ভাষার উপর কর্তৃত্বের ফলে, কতদূর পর্যন্ত রমণীয় রচনা সম্ভব, তার দৃষ্টান্ত 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'; পত্রপ্রাপিকা বালিকাটিকে রবীন্দ্রনাথের কিছুই বলার নেই, শুধু খেলাচ্ছলে তার উপযোগী কথা বয়ন ক'রে যাচ্ছেন, এবং ফলত যা দাঁড়িয়েছে তা সকলের পক্ষেই সম্ভোগ্য। একে এক ধরনের 'বিশুদ্ধ সাহিত্য' বললে হয়তো ভুল হয় না।

মৃত্যুর আগে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের রচনার স্থায়িত্ববিষয়ে সন্দিহান হয়েছিলেন। রোগ ও জরা তাঁর মনকে তখন দুর্বল ক'রে দিয়েছে, তাঁর ভাষার তরুণ লেখকেরা অ-রাবীন্দ্রিক পথে অগ্রসর হচ্ছেন, সদ্যোভিন্ন মার্ক্সবাদের প্রভাবে এমন কয়েকটি অপবাদ তাঁকে শুনতে হচ্ছে যা একেবারেই অসাহিত্যিক ও অবান্তর। ভাবতে বেদনা বোধ হয় যে তিনি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এর ফলে দুঃখ পেয়েছিলেন; বিরুদ্ধ মতের উত্তর দেবার সুযোগ হারাননি, এমনকি তরুণ লেখকদের প্রতি ব্যঙ্গোক্তিও তাঁর পরিহাসের অন্তর্ভূত হয়েছিলো। বিশেষত তাঁর আয়ুষ্কালের শেষ বৎসরটিতে তিনি নিজের রচনা বিষয়ে অবিরলভাবে কথা বলেছেন—যা এর আগে কখনোই করেননি; তার অনেক অংশ শ্রুতিলিখিত প্রবন্ধাকারে বা বিভিন্ন লেখকের স্মৃতিকথায় বিধৃত আছে। বার-বার বলেছেন তাঁর ছোটোগল্পের কথা—যাকে কোনো-এক সমালোচক 'গীতিধর্মী' বলাতে তিনি ব্যথিত হন; তাঁর ছবির বিষয়ে মুখর হয়েছেন মাঝে-মাঝে; স্মরণ করেছেন লণ্ডনে রটেনস্টাইনের বাড়িতে সেই সন্ধ্যাটি, যখন ইয়েটস তাঁর ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'র পাণ্ডুলিপি পাঠ করেন। তিনি যে 'চোদ্দ অক্ষর মেলাতে' পারেন তা সহাস্যে মনে করিয়ে

দিয়েছেন আমাদের; অবশেষে বলেছেন, 'বাংলাদেশের লোককে আমার গান গাইতেই হবে; আর-কিছু যদি নাও থাকে, তবু আমার গান থাকবে।' কিন্তু অনেক কথা ব'লেও তাঁর গদ্য বিষয়ে কিছু বলেননি; এমন কি হ'তে পারে যে তাঁর নিজেরও মনে হয়নি যে তাঁর প্রসঙ্গে সেটাও আলোচ্য? সত্য, যিনি কবির অভিধা নিজের প্রাপ্য ব'লে জেনেছেন তাঁর আর-কিছু চাইবার থাকে না, ঐ একটি কথাতেই সব বলা হ'য়ে যায়; কিন্তু তাঁর গদ্যের স্বতন্ত্র দাবিকেও উপেক্ষা করা অসম্ভব। আজকের দিনে, তাঁর মৃত্যুর কুড়ি বছর পরে, সহজেই বলা যায় যে তাঁর গান বিষয়ে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে, এমনকি হয়তো উন্মাত্রিকভাবে; রেকর্ড, রেডিও ও সিনেমার বিপুল প্রচারের ফলে বাংলাদেশে আজ প্রায় এমন কেউ নেই যিনি তাঁর গানের দু-চার কলি না জানেন, কিন্তু অনেকে হয়তো সেটুকুর বাইরে তাঁকে আর কোনোভাবে জানেন না। শিক্ষিত তরুণেরাও তাঁর গানের দ্বারা যতদূর মোহিত তাঁর পঠনীয় রচনাদির সঙ্গে ততদূর পরিচিত নন; তাঁর প্রতিটি কাব্যগ্রন্থ পাঠ করেছেন এমন যুবক আজকের দিনে বিরল; এবং তা নিয়ে আক্ষেপ করাও বৃথা, কেননা যুগধর্ম অপ্রতিরোধ্য, রবীন্দ্রনাথের 'প্রত্যাবর্তনে'র জন্য অপেক্ষা করা ভিন্ন উপায় নেই। সেই দিনের উদ্দেশে ব'লে রাখতে চাই যে কোনো ভাবী পাঠক যখন সযত্নে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র গদ্যরচনা পড়বেন, তাঁর ধারণা হবে তিনি গদ্যশিল্পে বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ পুরুষ, এবং বিশ্বসাহিত্যেও গরীয়ান। বৈদেশিক কোনো-কোনো লেখকের কথা আমরা ভাবতে পারি যাঁরা তাঁর চাইতে ভালো নাটক, ভালো উপন্যাস বা প্রবন্ধ লিখেছেন, কিংবা যাঁদের গদ্য আরো তীব্র বা গভীর; কিন্তু গদ্য-শিল্পের এমন ঐশ্বর্য, এমন বিচিত্র বৈভব আর কারো রচনায় প্রকাশ পেয়েছে কিনা সন্দেহ। একজন কবির বিষয়ে এই কথাটা খুব আশ্চর্য শোনায়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে অপরিমেয়রূপে প্রতিভাবান ছিলেন সেটা তো তাঁর অপরাধ নয়।

ছুটি কবিতা

অমর ষড়ঙ্গী

অনুভব

সে যদি অপরিহার্য তবে কেন মন
বার-বার নিরুত্তর ? জাফরানি পড়ন্ত বিকেলে
প্রত্যহ আসে যায়, প্রাকৃত ভাষণ।
ধান কাটা শেষ হলে আদিগন্ত মৌন শূন্যতায়
ভরে তীব্র অসহ্য ক্লান্তিতে, প্রগাঢ় আঁধার
নরম সহজ এক শান্তি আনে দেহের সীমায়।
ভালোবেসে অন্তরঙ্গ, তার নাম স্বপ্নে মনে হয়
ছুই আত্মা অবিচ্ছিন্ন সে-নারী অসূর্যম্পশ্যা নয়।

যে-ধারণা ছিলো

যে-ধারণা ছিলো, তার অনুদ্ভিন্ন নিভৃত নিলয়ে
পরিত্যাগ ক'রে মন দীর্ঘ উপবাসী
নাগরিক হ'তে চায় ; প্রেমাস্পদা বুঝি কোন সুন্দরী উর্বশী
সুসংহত যৌবনের একমাত্র অবলম্বনীয়। মৃত্তিকাকে ছুঁয়ে

শপথ অত্যন্ত সত্য ; রোদের শিকড়ে
সতেজ, অপরিমিত তেজ।ক্ষয় সভ্যতার স্বাদ ;
নিশ্বাসে কয়লার গন্ধ। প্রশমিত বৃষ্টি ঝড়ে
উত্তেজনা পিকেটিং, ধর্মঘট। পলেস্তরা-খ'সে-পড়া উন্নত প্রাসাদ

যুগপৎ মহাশ্চর্য ; কালক্রমে নতুন পৃথিবী
ধীরে-ধীরে উজ্জীবিত। অথচ স্থাপত্যকার্যে অভিজ্ঞতা নেই।
বিদ্যুৎ, অ্যাটম আর রকেটের অবশ্যম্ভাবী
ফলাফল ব্যক্ত হয়। পরিণত, সমৃদ্ধ রূপেই…

কৃত্রিম, অভ্যাসপুষ্ট। ক্ষণস্থায়ী নাগরিক মন
বিমৃষ্ট, বিষাদক্লিষ্ট। সাজঘরে রূপবতী নর্তকীর গাল।
ধারণাবিমুক্ত চিন্তা : অনেকাংশে ভালো আজ কৃষ্ণচূড়া, জারুলের বন।

দুটি কবিতা

অমিতাভ খাস্তগীর

সেই পাগল

সেই এক দুর্লভ পাগল
প্রথম কোথায় কবে মনেও পড়ে না।
লোহা ইট পার হয়ে, পার হয়ে বিকেলের সোনা
হয়তো বা শহরের অন্তিম সবুজে
আয়ুহীন স্তব্ধতাকে খোঁজে।

মুক্তবন্ধ প্রমিথ্যুস : মনে হয় দেখি যতবার
অনন্ত জিজ্ঞাসা নিয়ে কল্লোলিনী হ'য়ে আছে স্থির
স্তম্ভিত ঠোঁটের কূলে ; ভাষাহীন বিস্ময়ে গভীর
খনির রহস্য থেকে চোখ তার যেন আবিষ্কার।

মনে হয় কোনো-এক অপার্থিব মৌলিকের ধ্যান
আত্মার গুহায় ঢুকে নিয়ে গেছে তার অভিজ্ঞান
আমাদের পরিচিত যত কিছু হ'য়ে এসে পার
স্নায়ু তার ছেয়ে আছে ওপারের গূঢ় অন্ধকার।

সাবধানে দেখি তাকে, ভয় করে অন্তরঙ্গ হতে,
তার মত্ততায় যদি ছিঁড়ে যাই ?   যদি সে হঠাৎ কাছে এসে
ব'লে ওঠে, "আপনার মৃত্যু হ'লো কিসে ?"

ব্যর্থ প্রেমিকের গান

নরক কি এ-রকম ?   অচিকিৎস্য অনুশোচনায়
বিস্মৃতির স্বর্গে শেষে রয়েছে কি মুক্তি কামনায় ?
না কি সেখানেও শীত—হিমস্রব অথচ অঙ্গার,
আবার কটাহে যাবে এ-উচ্ছিষ্ট তৈলাক্ত হৃদয় ?

হে স্মৃতি, সুন্দর তরী, দুজনে তো ঘুরেছি অনেক
মুখর মাতাল স্রোতে, উন্মথিত লবণাক্ত নীরে
অপ্রমত্ত ভোরে পাড়ি ; শেষ হ'লো সোনাজলা তীরে,
শেষে তোমাতেই আঁকি প্রেমচিহ্ন, হোক অভিষেক।

নরক এমনই বুঝি ?   সর্বস্বান্ত, ছায়ায় গম্ভীর !
তেমন বিব্রত নই, ছায়াপথ আত্মীয় নারীর,
তাদের শরীর আজো প্রজ্বলন্ত স্বপ্নের কণায়
আমি তো ফোটাতে পারি চিরন্তন, মরীচিকাময়।

দুটি কবিতা

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

আদিগন্ত

নিশিদিন ঝ'রে যাই বসন্তের কীর্তিনাশা তাপে।
শরীরে আসঙ্গ ফোটে, কাটে বেলা বিপুল বিষাদে ;
অনেক দূরের ঘ্রাণ কাছের গোলাপে পেতে চেয়ে
বুকের বাগান ভেঙে একটি পাখির দৃশ্য ঊর্ধ্বে উঠে যায়।
আর এক আবির্ভাব শোণিতের শেষ বিস্ফোরণে
আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে জ্বালায় উন্মাদ শিখা চোখের নিখিলে ;
এবং তখনি—

আমার সমস্ত শ্রম অনায়াসে ব্যাপ্ত দেখি দিগন্ত অবধি।

বিনিময়

তুমি ফোটো চতুর্দিকে, বৃক্ষমূলে আমি ব'সে থাকি।
একদা দুর্বার রাত্রি একমাঠ উধাও আকাশে
নক্ষত্রের মতো দীর্ঘ যত দীপ্ত বাসনার শীর্ষ ছুঁয়েছিল
—আজ তারা কেউ নেই ভোরের অম্লান অবকাশে।

যা লিখি, লিখেছি, সব শুধু তুমি, তোমারি প্রতিমা।
আমার গোলাপ তবু বিহ্বল ধুলোর নিরুপায়ে
কাঁটার রক্তাক্ত ক্ষোভ ব্যাপ্ত করে অনিঃশেষ জ্যোতির দহনে।
তুমি তাকে কোনোদিন ওই দূর মন্দিরের গম্ভীর পাষাণে
যদি স্পর্শ করো, তবে চেয়ে দেখো দুঃখের দুর্লভ মধুরিমা
কী গভীর রূপে মুক্ত দেবতার দক্ষিণ বাহুর বরাভয়ে ;

কে কাকে ফোটায় শব্দে, কবিতায় কান পাতি জয়ে, পরাজয়ে।

সন্ধিলগ্ন

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

আহুতি দেবার লগ্ন এসেছে অন্ধকারের যজ্ঞে,
সময় সহসা ঝলকে উঠলো কালপুরুষের খড়্গে,
প্রতিবিম্বিত দর্পণে কাঁপে অসমসাহসী দৃশ্য
চতুর্দিকেই ঘুরছে চতুর অবিকল অবিমৃশ্য।

অতএব নব নাগরিকতায় আমরা দুজন বন্দী,
অধুনা বিবেকী বন্ধু স্বয়ং প্রণয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী,
সুহৃদবর্গ খড়্গহস্ত শাসায় ধ্রুপদী সাক্ষ্যে
ললিত শুভ্র কম্প্র কঠোর সাজানো সরল বাক্যে।

যেহেতু আকাশে বাউল বাতাস চৈত্রদিনেরা দৃপ্ত,
সঙ্গবিহীন ধূসর শূন্য বাসনা অপরিতৃপ্ত,
আগ্নেয় নীল নদীর শরীর চিবুক বক্ষ পৃষ্ঠ—
অন্ধকারের মৃত্যুলগ্নে আলোকিত পরিশিষ্ট।

সুতরাং মৃদু বন্দনা করি কাব্যবিহীন পদ্যে
প্রলয়ের মতো নিঝুম রক্তে আসবে মধ্যে মধ্যে,
আপাতত আছি নিরাপত্তার স্বয়ং-সৃষ্ট স্বর্গে
সহসা সময় ঝলকে উঠলো কালপুরুষের খড়্গে।

জনান্তিকে

(পোল ভালেরি অনুসরণে)

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কী কাজ করো তুমি ?—সবি তো ক'রে থাকি।
মূল্য কত, বলো।—মূল্য ? মুশকিল !
যেমন এই ধরো বিরাগ তিল-তিল
পূর্ণ জ্ঞান আর অরুচি দ্বেষ ফাঁকি···
মূল্য কী তোমার ?—তা বলা মুশকিল···
কী চাও ?—কিছু না ; তা সবি তো নিয়ে থাকি।

কী তুমি জানো, বলো।—বিরক্তির সীমা।
করো কী সর্বদা ?—স্বপ্ন দেখি খালি ;
এবং ঘটে আছে বুদ্ধিভরা ডালি—
তা দিয়ে রাত করি উষার রক্তিমা।
করতে পারো কিছু ?—স্বপ্ন দেখি খালি,
তাতেই দূর হয় মনোরচিত অমা।

কী চাও, ঠিক বোলো।—আত্মমঙ্গল।
জানো কি কোনো পথ ?—তা-ই তো খুঁজি রোজ—
সব যে ঘিনঘিনে নষ্টামির ভোজ
তাই জ্ঞানের বল খুঁজি অনর্গল।
তাহ'লে কিসে ভয় ?—ইচ্ছে, তার তেজ।
তুমি কে ?—অভাজন, কেউ না, দুর্বল।

কোথায় চলেছো হে ?—বিলুপ্তির কাছে।
সেখানে করবে কী ?—থাকবো প'ড়ে মৃত ;
সেখানে আর নয়, যেখানে অবিনীত
দিনের পর দিন পচবো একই নাচে।
যাচ্ছো কোনখানে ?—কবরে নিশ্চিত।
কবরে ? সেখানে কী ?—মৃত্যু জেগে আছে।

সমুদ্র-কে

বটকৃষ্ণ দাস

সমুদ্র যেন যামিনী রায়ের পট,
রঙে ও রেখায় অপরূপ ব্যঞ্জনা ;
রুখু-রুখু চুলে অনাদিকালের জট—
যেন কোনোদিন বিনুনি হয়নি বোনা,
রভসে গোঙায়, আহা, বিরহিণী নারী।

মনোভার যেন বইতে পারে না দেহ,
দুঃসহ পীড়া সহস্র ধমনীতে,
স্তনচূড়া তার বেদনামথিত স্নেহ,
বিগলিত ধারা উদরের ত্রিবলীতে,
বাহুভুজে প্রেম দিগন্তসঞ্চারী।

সমুদ্র, আমি সুদূর মফস্বলে
দুঃখিত এক অন্ধগলিতে থাকি,
শিক্ষকতায় কোনোমতে দিন চলে,
ফাঁক পেলে দেশী বিদেশী কবিকে ডাকি,
একযোগে কোনো দূরান্তে দিই পাড়ি।

পাড়ায়-পাড়ায় লোনা হাওয়া এসে ডাকে :
সমুদ্র, তাই তোমার কাছেই আসি,
কিছু পাই, কিছু ভাবনায় মিশে থাকে,
কিছু তার হাতে দিই যাকে ভালবাসি,
কিছু কেড়ে নেয় জীবনের বালিয়াড়ি।

ওগো বধূ সুন্দরী

আবুল কাশেম রহিমউদ্দীন

সাগর-পারের ওগো বধূ সুন্দরী
সাগর তোমার মূর্ছিত পদতলে ;
বুকের গভীরে ডুবেছে সোনার তরী,
বাসি অমৃত-ও একাকার নোনা জলে !

আকাশে কেবল মাতাল বৃদ্ধ চাঁদ
উলঙ্গ মেঘে মনের বেহালা বাজায়।

অনেকে সেদিন এসেছিল নানা রূপে :
কেউ আলো, কেউ ফুল বা রূপের ডালা
এনেছিল আর চেয়েছিল চুপে-চুপে
তোমারই গলায় পরাতে তাদের মালা।
কিন্তু মজেনি অটল তোমার তনু,
কারণ ওরা যে অপটু সবাই গানে,
ওদের কথায় ফোটে না ইন্দ্রধনু—
সে-জাদু কেবল সাগরই তখন জানে।

তাই তো সেদিন সাগরে পাঠালে প্রেম,
সাগর নিজেকে তোমার তরেই সাজায়।

কিন্তু হঠাৎ ক যে হয় তারপরে :
ঢেউয়ের বাসরে দোল খায় ঘনঘটা,
এপারে-ওপারে আকাশ আছড়ে পড়ে—
মহাকাল তার দিগন্তে ঝাড়ে জটা।

চকিত কাতর সাগর দাঁড়ায় ঘুরে,
সূর্যের মুখ অভিসম্পাতে কালো,
সংগীত মরে ঝড়ের অশ্বখুরে,
দেহ ঢেকে নেয় কবরে দিনের আলো!

বহুকাল পরে যখন বৃষ্টি নামে—
সাগর তখন লাঞ্ছিত দেহে লোটায়।

সাগর-পারের ওগো বধূ সুন্দরী,
সাগর তোমার মূর্ছিত পদতলে;
বুকের গভীরে ডুবেছে সোনার তরী,
বাসি অমৃত-ও একাকার নোনা জলে!

তবুও কি তুমি তাকেই কামনা করো,
বাসনা তোমার গোপনে কি ফুল ফোটায়?

পোল ভেরলেন-এর দুটি কবিতা

অনুবাদ : **গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়**

প্রিয় স্বপ্ন

আশ্চর্য, উজ্জ্বল স্বপ্নে অজ্ঞাত নারীর অভ্যুদয়
দেখি আমি, সে-বরবর্ণিনী প্রিয়া, আমি প্রিয় তার;
দেহমনে আদিরূপা সে আর হবে না, কিন্তু নয়
অন্যরূপা; ভালোবাসে, খুঁজে ছাখে রহস্য আত্মার।

সে-মর্মবেদিনী নারী, সমুজ্জ্বল আমার হৃদয়
তার অনুচিন্তনেই,—যা দৃশ্যত একান্ত সরল
তা শুধু তাকেই ভেবে; আর যে আর্দ্রতা সমুচ্চয়
আমার ললাটে, মুছে দিতে পারে তারই অশ্রুজল।

সুন্দরী, রেশমচুল; মলিনা, তামাটে; কিংবা লাল
চুল তার? কী যে নাম? কী মধুর প্রতিধ্বনিময়!
প্রেমিক-প্রেমিকাদের দিন যেন চলে ধীর লয়ে।

দৃষ্টি তার, পাষাণের প্রতিমার চোখে রেখাজাল;
স্বর তার, শান্তি আর দুঃখে যেন হয়েছে সংশ্রয়;
উচ্চারণ তার, মৃত প্রেমিকার স্মৃতি আনে ব'য়ে।

বড়ো রাস্তাগুলি

এসো তবে নাচি!

ভয়ানক ভালোবাসতাম আমি তার দুটি চোখ,
তার দুটি চোখ, যার কাছে ছার তারার আলোক;
ভালোবাসতাম আমি যে তাদের চকিত চমক।

এসো তবে নাচি !

তার যে জীবন এমনই আবাঁধা ছিল সত্যিই,
মানে না শাসন সে-হৃদয়, ছিল মধুতে ভর্তি ;
আর সে, জীবন নিলো ; যেন নেই মায়ার রত্তি।

এসো তবে নাচি !

তারপরে শুরু হ'য়ে যায় তার স্মৃতির বেদন,
ফুলের মতন অধরে ঢেলেছে কতো চুম্বন···
তখনো আমার হৃদয়ে যে তার হয়নি মরণ।

এসো তবে নাচি !

মনে প'ড়ে যায়, মনে প'ড়ে যায়, তাকে আজো হায় !
ঘন চিন্তার কুহেলিকাজালে সন্ধ্যাবেলায়
সব চেয়ে সেই নিরালা প্রহরে তাকে ভাবা যায়।

এসো তবে নাচি !

স্মৃতিচিত্র

গোপাল ভৌমিক

স্মৃতিগুলি স্থির চিত্র
ফ্রেমে-আঁটা মনের অ্যালবামে :
খুশি হ'লে খুলি পাতা
উল্টে যাই উন্মন খেয়ালে ;
অতীতের অভিক্ষেপে হই যদি নেহাৎ বিমনা
প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসি আর খুলবো না।

আমি তবু ভাগ্যবান,
স্মৃতিগুলি চলচ্চিত্র নয় ;
হ'লে তার সঞ্চরণে
প্রতিদিন শরীর—সময়
বিদ্ধ হ'ত ক্ষমাহীন যন্ত্রণার শরে।
যেত না সাধনা করা অতীতের শবের উপরে।

এখন সে জাদুঘর :
খুশি হ'লে যেতে পারি
ভুলতেও পারি ইচ্ছে হ'লে।
হাসি- ও বেদনামাখা
স্থির চিত্র আমি দেখি
বর্তমান-আরশিতে মুখের বদলে।

অপূর্ণের অন্তিম মন্ত্র

লোকনাথ ভট্টাচার্য

আশীর্বাদ করো, হে চরম কুটিল, হে পরম সরল, হে মহান। আশীর্বাদ করো।

আশীর্বাদ করো এই হাওয়া, দুঃখ বেদনা আনন্দ, আশীর্বাদ করো। আশীর্বাদ করো হাই তোলা, আশীর্বাদ করো তুচ্ছতা, আশীর্বাদ করো সূর্যাস্তের মেঘের মহিমা। আশীর্বাদ করো।

কেন আশীর্বাদ? কারণ তাইতেই যে খোলে পথ, তাইতেই ফুল ফোটে।

এই দিন, এই রাত, এই চিরকাল ধ'রে আমি এক সন্ত-শেষ-করা কবিতার কবি, মুখে টক-টক গন্ধ, বুকে বেদনা। যা শেষ করেছি, তা পেল না সুর সমাপ্তির, যা আরম্ভ করব, তার বাজেনি আগমনী। ওগো আমার লাগল না ভালো, আশীর্বাদ করো।

তোমার মুখ কেবলি জেগে ওঠে, আর হারিয়ে যায়। এই পথে, এই ভিড়ে, এই অনন্ত গাড়ির স্রোতে, এই সারি-সারি অট্টালিকায়। কখনো আধখানা চোখ, কখনো ঠোঁটের একটি কোণ। জেগে ওঠে, হারিয়ে যায়। আশীর্বাদ করো। খণ্ড-খণ্ড মুহূর্তের খোঁড়া অনুভব চলল না সকাল-বিকাল-সন্ধ্যা ধ'রে রাত্রির শিবিরে। আশীর্বাদ করো।

শুধু আমি, আমি আর আমি। এই দীনতা, এই অহংকার, আশীর্বাদ করো। যা-কিছু রইল বাইরে আমার, যা-কিছু চাইল আলো, যা-কিছু চায়নি আলো এখনো, আশীর্বাদ করো।

তুচ্ছতায় রয়েছ তুমি, অপূর্ণতায় হেসেছ তুমি। তোমাকে ভালোবাসার প্রচণ্ড স্পর্ধা আমার, আশীর্বাদ করো।

দুটি কবিতা

তারাপদ রায়

ঈশ্বরপ্রতিম

সব নারিকেলতরু স্থির, জানি ক্ষীণ আন্দোলনে
এদের সম্মতি নেই। নিশ্চিত ঝড়ের পূর্বাভাসে
ঈশানে জমেনি মেঘ, তবু স্থির অন্ধকার আসে,
আসে অন্ধকার, শূন্য অন্ধবৃষ্টি, জীবনে-মরণে।
আমি এই অন্ধকার কিংবা মৃত্যু কিংবা সনাতন
ঈশানের পুঞ্জমেঘ প্রার্থনা করিনি; দিনশেষে
তবু এই অধীনের মলিন অঞ্জলি গেলো ভেসে,
প্লাবিত সচ্ছল স্রোতে বৃষ্টিধারা ভাসালো গগন।

কে তোমাকে সব দিলো; এই স্মৃতি ক্লান্তমেঘভার
গোধূলির তীব্র বৃষ্টি, জলসিক্ত অস্পষ্ট পৃথিবী;
ঊর্ধ্বগ্রীব নারিকেল, বৈঁচিবন, রুক্ষ উইটিবি,
প্লাবনে ভাসালো সব, সব সীমা, তীব্র স্রোতধার,
বাইরে ত্রিভুবনময় অন্ধকার মুখর অসীম,
কেউ কাউকে ডাকবে না, এই বৃত্ত তোমার একার,
এই জলমগ্ন দ্বীপ, এই ঝড়-জল-অন্ধকার
দিগন্তে বিদ্যুৎলতা, ছাখো, দীপ্তি ঈশ্বরপ্রতিম।

মালিনীর প্রতি

যৌবন সমীপে এসে দাঁড়ায়ো না; দূরে যথা স্মৃতি,
বর্তমানে প্রবাহিত; যথা গ্রামপ্রান্তে স্রোতস্বিনী

তীরবর্তী স্পন্দমান—অনুরূপ থাকো ; হে মালিনী,
তোমার মালঞ্চ হতে একটি কুসুম শুধু প্রীতি-
উপহার দিতে পারো। কোনোদিন গোধূলির তীরে
চিত্রার্পিত অলিন্দে দাঁড়াতে পারো ; উজ্জ্বল দুরাশা,
অথবা বসন্ত কালে নগরীর প্রান্তে ফিরে-আসা
ক্ষীণায়ু দাক্ষিণ্যে থাকো আবর্তিত বিখ্যাত সমীরে।

এতদিন এত যত্নে কী ফোটালে, পদ্ম না পলাশ ?
যা-কিছু ফোটাও তুমি সাজিভরা তোমার একার,
এই ক্লান্ত জনপদে চিরায়ত সুদীর্ঘ যাত্রার
আমি অনুগামী মাত্র, আমি জীবিকার ক্রীতদাস,
অন্নাশ্রয়ী ; প্রতিদিন তোমার কাননে, হে মালিনী,
ফুটুক বিবিধ পুষ্প। তুমি থাকো অন্তরালে দূর,
ধূসর দিনের ঊর্ধ্বে চিরস্থায়ী লাবণ্যে মধুর
প্রীতিবহ ; তুমি থাকো স্মৃতিময় স্বপ্নাচ্ছ কাহিনী।

সেবা

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

এবার কেহ এসে নিবিড় ভালোবাসুক।
উষ্ণ-শীতল, লুব্ধ-ফিকে, শাদা-কালো
অনেক রকম পা ফেলেছি চতুর্দিকে ;
উপবনে গন্ধশিকার ক্লান্ত করে !

হাতের কাছে ফুটুক কেহ আপন তাপে,
অঞ্জলিতে নগ্ন সুধা নিরভিমান।
বুকের তলে ছায়া দোলাক নীল জলাশয়
ঢেউ যেন না দুর্বিনীত আগের মতো।

ডেকো না সেই উল্লসিত রণাঙ্গনে
যুদ্ধ বড়ো নেশায় নাসারন্ধ্র, রাহু
উষ্ণ ক'রে কাঁপায় ঝড়ে, অস্ত্রাঘাতে
লুণ্ঠিত শোক ধূলায় রচে ঘোর বিরহ।

অশ্বটিকে দাও ছেড়ে নীল দূরের মাঠে ;
শাখায় মৃদু ফুটছে পাতা, ঠাণ্ডা খুশি।
হঠাৎ ভালো লাগে সেবা, জানি না তো—
কতক্ষণ এ-তাঁবুর নেশা ; স্থির জলাশয়
কতক্ষণ যে ধরবে ছায়ার পরমায়ু।

জল, ভূমণ্ডল, আত্মা—

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

‘আত্মার বয়স কতো, মাঝিভাই ?’   মধ্যরাতে উঠে
রমেন জিজ্ঞাসা করে : ‘তুমি কি কখনো করপুটে
আত্মা রেখে তার উত্তাপ গ্রহণ করেছো ?   বলো তার
বাহির শীতল কেন ?   যেমন এ-নদীর কিনার,
নিঃসাড়, সহস্র দুঃখে রা কাড়ে না, তেমনি আত্মার
নয় প্রচ্ছদপট ?   সে-মলাট যদি যেতো টুটে
তবে কি রবীন্দ্রনাথ মরতেন না শমী’র মৃত্যুতে ?’

আকাশগঙ্গা

নবনীতা সেন

বৃথা চিন্তা ছেড়ে দিয়ে আকাশে তাকাও।
পবিত্র, বিমুক্ত, বুদ্ধ, অশোক অসীমে
সিন্ধুর সাযুজ্য ছাখো, তরঙ্গিত তারা
একে-একে দুলে ওঠে।
আকাশে তাকাও,
মধ্যরাতে দিবারম্ভ এমন বিদেশও
সহসা বাজাবে ঘণ্টা অকালবোধনে।

স্মরণ : ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

ইন্দিরা দেবীর জীবন ও সাধনাকে যাঁরা জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে জন্মসূত্রে সংলগ্ন একটি সুরেলা যন্ত্র হিসেবে দেখেন, বর্তমান লেখক তাঁদের অনুপন্থী নন। একথা ব’লে ইন্দিরা দেবীর ভৌগোলিক তথা ঐতিহাসিক প্রেক্ষণীটিকে আমি অস্বীকার করছি না। শুধু এই কথাটাই স্পষ্ট গলায় উচ্চারণ করতে চাই, ও-রকম বিচার আপেক্ষিক তো বটেই, উপরন্তু বহির্বিবেকী।

এর কারণ তাঁর ব্যক্তিত্ব, এবং সেই ব্যক্তিত্বের চাহিদা। সৃজনের চেয়েও সৃষ্টিরক্ষার বেদনা, উদ্ভাবনার চেয়েও শুশ্রূষার দায়িত্ব যে বড়ো কম নয়, সেকথা তিনি প্রয়োগসিদ্ধরূপে বুঝেছিলেন। সৃষ্টি বলতে অবশ্য তিনি রবীন্দ্র-বিতানের প্রসূনসম্ভারকেই বুঝেছিলেন। সৃষ্টিসংরক্ষণের ক্ষেত্রে তাঁর ছিলো জ্ঞানমিশ্র ভক্তিযোগীর ভূমিকা।

জ্ঞানাঞ্জন তাঁর বিস্ময়কে মননে পরিণত করেছিলো। রবীন্দ্রনাথ কথা বলেছেন প্রত্যক্ষ ধ্যান থেকে, প্রমথ চৌধুরী—অনেক সময়েই—স্বকপোল-নির্ণীত ধারণার বশে। ইন্দিরা দেবী কিন্তু সমস্ত কিছুই সংজ্ঞা থেকে আরম্ভ করতেন। এই সংজ্ঞাসন্ধিৎসা থেকেই তাঁর এত যথাযথ হবার পরিশ্রম, অনুপুঙ্খ স্বচ্ছতায় উপনীত হতে চাওয়ার তাগিদ।

তাঁর স্বরলিপিচেতনার মূলেও সেই একই প্রবণতা কাজ করছে। রবীন্দ্র-সংগীত-শিক্ষার্থীর স্মৃতিতে তিনি স্বরলিপির সরস্বতী হয়ে বিরাজ করবেন। গানের পবিত্রতা বজায় রাখবার প্রয়োজনে স্বরলিপির উপযোগিতার কথা জোর ক’রে বোঝানোর দরকার করে না। সে একরকম স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয় বলা চলে। কিন্তু ইন্দিরা দেবী সিদ্ধান্তে আসবার আগে আবার ভালো ক’রে ব্যাপারটাকে খুঁটিয়ে দেখে নিতে চান। তাই বৈদিক এবং সার্গমিক পদ্ধতির তুলনা করতে গিয়ে তাঁকে বলতে হয় : “পাছে কেউ মনে করেন যে আমি গায়ের জোরে একথা বলছি, সেইজন্য আমি স্বরলিপির মূল উপাদান একটু

বিশ্লেষণ করে দেখাতে ইচ্ছা করি।...শ্রুতিগোচর স্বরকে প্রথম দৃষ্টিগোচর ও পরে কণ্ঠস্থ ও যন্ত্রস্থ করাই স্বরলিপির মুখ্য উদ্দেশ্য, একথা সর্ববাদিসম্মত। আমি যা কানে শুনছি, কোন চিহ্ন বা অক্ষর দ্বারা সেটিকে এমন বিশদভাবে লিখতে হবে, যাতে সেই লিপি দ্বারা অপর-যারা কানে না শুনেছে, তারাও লিখিত স্বরটিকে অবিকল গলায় বের করতে পারে।"

তীব্র এই সতর্কতার সঙ্গেই তিনি রবীন্দ্রসংগীতের মুখোমুখি হয়েছিলেন। "ভাঙা গানের তালিকা" রচনা ক'রে রবীন্দ্রনাথের গানে অপরাপর সুরের ধারা এবং ভাবধারার প্রভাব নির্ধারণ করেছিলেন। কাজটি যে কতোখানি শ্রমসাধ্য, তাঁর "রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম" নামক প্রাসঙ্গিক পুস্তিকার সুচারু বিন্যাস দেখে একথা ক'জন বুঝবেন, জানি না। কিন্তু যাঁরা কথনো-না-কথনো তাঁর কাছাকাছি এসে পড়েছেন, তাঁরাই জানেন, মসৃণ এতটুকু শিল্পরূপে পৌঁছবার জন্য কী অমিতপরিমাণ কান্তি তিনি ক্ষয় করতেন! এক স্তবকের একটি গানও কেউ কথনো তাঁর কাছে একদিনে শিখে উঠতে পেরেছেন কিনা, আমার জানা নেই। কারণ প্রতিটি পংক্তির প্রচ্ছায়া, প্রত্যঙ্গের স্থাপত্যের সঙ্গে তিনি তাঁর শিক্ষার্থীর সান্নিধ্যসাধন করাতেন। ফলে হয়তো একটি চরণ শিখে নিতেই একটি দিন কেটে যেত।

ক্রমবর্ধিষ্ণু জনপ্রিয়তার সঙ্গে-সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতের নায়কী আর গায়কীর[১] অনিবার্য ব্যবধান দুস্তরতর হচ্ছে। শহরের অলিতে-গলিতে নিত্যনতুন গীতায়তনগুলিতে পল্লবগ্রাহকদেরই নৈরাজ্য। অন্যদিকে রবীন্দ্রসংগীতের বিশেষজ্ঞদের নিজ-নিজ সংস্কারের অসেতু স্বরাজ। আবার, রবীন্দ্ররচিত গানের অনুশীলনের পথে নিশ্চয় "যতো মত ততো পথ" নীতি খাটে না। ইন্দিরা দেবী তাঁর স্বাভাবিক ও সুগভীর অসন্তোষ নিয়ে রবিপ্রদক্ষিণপথটিকে পরিচ্ছন্ন রাখতে চেয়েছিলেন। এ বিষয়ে তিনি শান্তিদেব, শৈলজারঞ্জন কি অনাদি দস্তিদার কারো মতামতই তুচ্ছ করতেন না, পরন্তু তাঁর শিষ্যপ্রতিম

১ নায়কী—পুঁথিগত বিদ্যা, শাস্ত্রনিহিত তত্ত্ব।
গায়কী—গুরুমুখী বিদ্যা, শিক্ষকনির্দেশিত-বা ব্যক্তিসাপেক্ষ প্রয়োগরীতি।

সতীর্থদের প্রবর্তিত গীতরীতি ও স্বরলিপি সংক্রান্ত যে-কোনো সংবাদই তাঁর কাছে সস্নেহ বিবেচনা লাভ করেছে। কিন্তু, অন্তিম বিশ্লেষণে, তিনি ঠিকই বিভিন্ন পন্থার মধ্য দিয়ে পথ কেটে সেই রাজপথে এসে দাঁড়াতেন, যার নাম রবীন্দ্রসংগীত। আর স্বরলেখশুদ্ধিই ছিলো তাঁর সেই আজীবন-অনুসৃত মন্ত্র যার সাহায্যে তিনি এই পথে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। ইন্দিরা দেবী শিল্পকে বিজ্ঞানের মধ্যবর্তিতায় অবিকৃত রাখতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রসংগীতের নায়কী ও গায়কীর একটি মীমাংসাজনক মেলবন্ধনে তিনি বৈজ্ঞানিক মনোভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন।

কিন্তু তাঁর এই সব কঠিন কার্যসূচী যখন বুঝিনি, সেই স্বচ্ছন্দ ছাত্রাবস্থায় তাঁকে আমি আরেকভাবে জেনেছিলাম, আরেকভাবে নিবিড় শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের অপ্রতিহত সুযোগ পেয়েছিলাম। শান্তিনিকেতন পাঠভবনের সামান্য একজন বালক হলেও ঔৎসুক্য দিয়ে তিনি আমায় সম্মানিত করেছিলেন। সেই ব'সে-থাকার নিবিষ্ট জাগর ভঙ্গি, সেই মুকুল-ঝরানো আলাপচর্চা আমি কিছুতেই ভুলতে পারবো না। আর যখন এই স্মৃতিরেখা আঁকতে বসেছি, তাঁর শারদীয় মুখমণ্ডল বারংবার এসে আমাকে অন্যমনস্ক ক'রে দিচ্ছে।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

[পরপৃষ্ঠায় গ্রাহকদের প্রতি নিবেদন দ্রষ্টব্য]

কবিতাভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯ থেকে প্রকাশিত ও নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৭ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা ১৩ থেকে মুদ্রিত।
সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রক : বুদ্ধদেব বসু

গ্রাহকদের প্রতি নিবেদন

'কবিতা'র এই আষাঢ় সংখ্যার সঙ্গে আপনার বর্ষ ২৪-এর চাঁদা নিঃশেষিত হ'লো। বর্ষ ২৫-এর প্রথম সংখ্যা (আশ্বিন, ১৩৬৭) আগামী ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে প্রকাশিত হবে। আমাদের বিশেষ অনুরোধ এই, ২০শে নবেম্বরের মধ্যে আপনারা নতুন বছরের চাঁদা (চার টাকা, রেজিস্টার্ড ডাকে ছয় টাকা) মনি-অর্ডারযোগে অনুগ্রহ ক'রে পাঠিয়ে দেবেন। যাঁরা গ্রাহক থাকতে আর ইচ্ছুক নন, তাঁদের নিষেধাজ্ঞাও ঐ তারিখের মধ্যে পৌছনো দরকার। চাঁদা বা নিষেধাজ্ঞা যাঁরা পাঠাবেন না তাঁদের প্রত্যেকের কাছেই আশ্বিন সংখ্যাটি বার্ষিক মূল্যের ভি. পি. ডাকে আমরা পাঠিয়ে দেবো ; মাশুলসমেত খরচ পড়বে পাঁচ টাকা, যাঁরা রেজিস্টার্ড ডাকে পত্রিকা নেন তাঁদের পক্ষে সাত টাকা। ভি. পি. ডাক ব্যবহার করতে হ'লে আপনাদের ব্যয় ও আমাদের পরিশ্রম অনেকটা বেড়ে যায়, উপরন্তু ভি. পি. ফেরৎ এলে আমাদের যা আর্থিক ক্ষতি ঘটে তা তুচ্ছ নয় ; অতএব পুনশ্চ অনুরোধ জানাই যে কোনো কারণে চাঁদা যদি যথাসময়ে পাঠাতে না পারেন, অন্ততপক্ষে ভি. পি. প্যাকেটটি ফেরৎ দেবেন না। মনি-অর্ডারে চাঁদা পাঠাবার সময় নিম্নোক্ত নিয়মগুলি অনুগ্রহ ক'রে মনে রাখবেন :

(১) কূপনে নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর স্পষ্টভাবে উল্লেখ্য।

(২) নতুন গ্রাহকেরা "নতুন গ্রাহক" কথাটি কূপনে লিখে দেবেন।

(৩) যদি ইতিমধ্যে ঠিকানার বদল হ'য়ে থাকে, নতুন ঠিকানাটি কূপনে বা স্বতন্ত্র চিঠিতে লিখে জানাবেন।

নমস্কারান্তে,

বুদ্ধদেব বসু
সম্পাদক, 'কবিতা'
কবিতাভবন
২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯

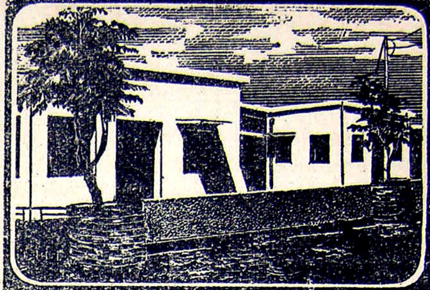

আপনি ঠিক যা চান

কল্যাণীতে

নিজের বাড়ী হ'লে তাই পাবেন

কল্যাণীতে জমি কিন্‌তে পারেন মাত্র মূল্যের এক তৃতীয়াংশ আগাম ও তারপর সহজ কিস্তিতে টাকা দিয়ে।

কল্যাণীতে নগরজীবনের সকল সুবিধাই পাবেন। খোলা মাঠ, মুক্ত বাতাস আর অল্প ভিড় কল্যাণীর বিশেষ আকর্ষণ। তা'ছাড়া কলকাতা থেকে কল্যাণী মাত্র ৩৫ মাইল দূরে।

বিশদ বিবরণের জন্ত লিখুন: কল্যাণী সেলস্ প্রমোশন অফিস—১৮৮-এ রাসবিহারী এ্যাভিনিউ, কলিকাতা ২৯ — ডেভোলপমেণ্ট ডিপার্টমেণ্ট, রাজভবন, কলিকাতা ও পাবলিক রিলেশনস্ অফিসার, কল্যাণী, জেলা: নদীয়া।

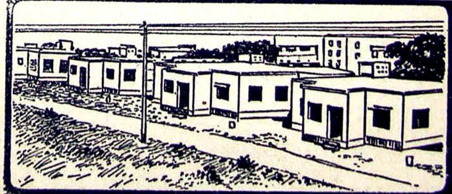

PPS-KB-1

KAVITA, Vol. 24, No. 4, Serial No. 102

KAVITA

(*Poetry*)

Vol. 24, No. 4

Serial No. 102

Yearly Rs. 4/-, or 6s. 6d. or $ 1. 50
Rupee one per copy

এক টাকা

Published quarterly at Kavitabhavan, 202 Rashbehari Avenue, Calcutta 29, India

Editor & Publisher : BUDDHADEVA BOSE